

মৃত্যুপথের যাত্রী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়



নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

৬৮, কালেক্ট

কলকাতা-৭০০ ০৭৫

প্রকাশক :

শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লি:

৬৮, কলেজ স্ট্রাট,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :

বি. সি. মজুমদার

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লি:

৬৮, কলেজ স্ট্রাট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

সহঃ দেবদত্ত নন্দী

প্রথম প্রকাশ

১লা জানুয়ারী, ১৯৩১

এক

ঢং ঢং ঢং—মাঝরাতের জমাট অন্ধকারের বুক চমকে দিয়ে এক হ-বাদ সেন্ট্রাল জেলের ঘণ্টা-ঘড়ীতে বারোটা বেজে গেল।

সারা সहर 'নিগুন্ক'। জেলখানার প্রতি কক্ষে কয়েদীর দল সারাদিনের পারিশ্রমের পর গাড়ী ঘূমে অচেতন। কেবল প্রবেশ দ্বারের লৌহ-ফটক বন্ধ কবে, তার ভিতরে দু'জন সঙ্গী-বারী-প্রহরী সজাগ হয়ে বসে আছে। এদের পালা রাত একটা পর্যন্ত। তার পরেই অপর দু'জন কনষ্টেবল এদের স্থান অধিকার নেবে। জেলখানার এই কঠোর নিয়মের এক চুল ব্যতিক্রম হওয়ায় উপায় নেই—অন্ততঃ যতদিন আমি এখানকার ভারপ্রাপ্ত 'ডেলার' বা জেল-রক্ষক।

জেলখানার বাইরে, ফটকের ঠিক সুমুখেই ডেল-অফিস আর পুলিশের থানা। তার ওপাশেই আমাদের কোয়ার্টার। আমরা এ্যাসিস্ট্যান্ট রামশরণ চৌবে অন্ত্র দিন নাইট ডিউটি করে থাকেন। কিন্তু আজ আমি ইচ্ছা করলে তাকে ছুটি দিয়েছি। নাইট ডিউটি আজ হচ্ছে আমার—কারণ, তাহলে আমার এন্ট্রি প্রয়োজন আছে।

বৃত্তান্তের বাড়ী

আজ ২৩শে এপ্রিল। আজকের রাতটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত দস্যু-সর্দার তেজশঙ্কর ফাঁসি-কাঠে ঝুলবে, পৃথিবীর বুক থেকে একটা নিষ্ঠুর ছর্ব্বত্তের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্ত মুছে যাবে। সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ সেই সুসংবাদ শোনবার জন্ত রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

তেজশঙ্কর বিখ্যাত দস্যু—তেজশঙ্কর মহা ছর্ব্ব। দস্যু হ'লেও সে একটন সাধারণ দস্যু নয়,—দস্যু-সম্রাট। সারা বাংলা আর বিহার প্রদেশে যতগুলি গুপ্ত দস্যুদল আছে, তেজশঙ্কর সেই সব দস্যুদের দলপতি। তার নামে পুলিশের মুখ চূণ হয়ে যায়—রাজপুরুষদের বুক কঁপে ওঠে। এই মহাপ্রতাপশালী দস্যু-সর্দারকে বনাম দেশে সরগার-পক্ষ বহু দিন ধরে বহু চেষ্টাই করে এসেছেন—কিন্তু বসেই থাকা হয়েছিল। তাঁকে ধরা তো দূরের কথা, উপরন্তু তার হাতেই বিস্তর পুলিশকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

তেজশঙ্কর নামজাদা নরহত্যা; বড় বড় খনী মহাজন, রাজা আর কামিদারের উপবেই তার যত আক্রোশ। বিস্তর ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকে সে নির্ধনভাবে হত্যা করে এসেছে। দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এই ১৬ টি প্রদেশের বৃকের উপরে মহা দার্পণ সঙ্গে সে চালিয়ে এসেছে তার অত্যাচারের রথচক্র—কিন্তু এতকালের মধ্যে কেউ তার হোতাগ্রে স্পর্শ করতে পারেন। কিন্তু অদৃষ্টের ঢাকা গ্রার খুব শক্ত হলেও ক্রমেই ঘুরে গেছে। বনের ছর্ব্বন্ত সিংহ তাই আজ এসে চলেছে মানুষের কারাগারে। আজ আর সে গৌরী-বারী চলেছে। সে এখন বন্দী—সে এখন ফাঁসির আসামী।

তার শেষ বিচারের দিন এলাহাবাদের হাইকোর্টে লোক আর

স্বত্বপথের রাজী

ধরে না। কোর্টের বাহিরে, পথের দুই ধারে লোকে লোকারণ্য ; কত দূর-দূর থেকে কত রকমের লোক এসেছে তাকে দেখতে। তাব বিচারের ফলাফল জানবার জন্যে কি তাদের উৎসাহ। কি উৎকণ্ঠ। ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়ার পর তাকে সেই ভিড় ঠেসে জেলখানায় ফিরিয়ে আনাই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

কাল ভোরে তাব সেই ফাঁসিব দিন। স্বাক্ষরের রাতটাই তার জীবনের শেষ রাত। আজ রাতেই তাই তার সঙ্গে আমায় দেখা কবাত হবে—তার সেই লোহাব ডাঙাঘেরা হাজত-ঘরের মধ্যে। এ যেন সিংহের খাঁচার ভিতরে ঢোকা,—সিংহের সঙ্গে কোলাকুলি করতে।

কাজটা দুঃসাহসেব বটে—কিন্তু তবু তা আমাকে করতেই হবে। এরই ভুলে রামশরণ চৌবেকে ছুটি দিয়ে নিজেই এই ‘নাইট ডিউটি’ ভার নিয়েছি।

তেজশঙ্কর দস্যু, তেজশঙ্কর দেশবাসীর আতঙ্ক, তেজশঙ্কর নর-সমাজের শত্রু। তবু আমার কাছে মোটেই সে একটা বিভীষিকা নয়। সে যে কে, এবং কি, তা আমি ঠিক জানি না ; কিন্তু তবু সে আমার একজন আপনার লোক।

তেজশঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় ছই—এক দিনের নয়—কয়েক বৎসরের। অথচ এর আগে তাকে আমি চক্ষুঃ কখনো দেখিনি ; আমার পরিচয় ছিল তার নামের সঙ্গে আব তাব এমন কতকগুলি বিশেষত্বের সঙ্গে, যা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে, অনেক বিচার-বিবেচনা করেও আমি কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারিনি।

তবু আমি জানতাম যে দস্যু-সর্দার তেজশঙ্কর একটা জাতি অসাধারণ লোক। মানুষের সমাজ দীর্ঘকাল ধরে তার এই নৃশংস

মৃত্যুপথের যাত্রী

বৃত্তির বিরুদ্ধে যত কিছু ঘণিত মন্তব্য প্রচার করে আসুক না কেন, তবু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না যে, সে বাস্তবিকই এই সব কুংসার উপযুক্ত। তাই সর্বসাধারণের কাছে সে যখন নির্ভূর নরঘাতক দস্যু, আমার ধারণায় সে তখন সেই বাহ্যিক পিশাচের ছদ্মবেশে একজন পরম দয়াল, দীন-দুঃখীর পরম উপকারী বন্ধু—অসহায়, অনন্যোপায় গরীব লোকদের মা-বাপ।

ফাঁসির আসামী তেজস্করের সম্বন্ধে আমার এই উচ্চ ধারণা জন্মেছিল অনেক বৎসর আগে, যখন আমি কলেজের ছাত্র, আর যখন মাত্র অল্পকাল পূর্বে আমার বিবাহিত জীবন আবিস্কৃত হয়েছিল। তার আগে এই দস্যু-সর্দারের নাম, সর্বসাধারণের মত আমারও কাছে অতি ঘৃণার বস্তু ছিল।

খঞ্জনপুরের মৃত রায়বাহাদুর শশিশেখর ঘোষালের কন্যা অনিতাকে আমি বিবাহ করি। বিবাহের পর হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম তার এক মহানুভব ধর্মভায়ের নাম। ভগ্নীর শুভ বিবাহে দাদার আশীর্বাদের উপহার বলে সেই ধর্মভাই নাকি এক জোড়া জড়োয়ার ব্রেসলেট, আর গলার একছড়া জড়োয়ার নেকলেস তাকে পাঠিয়েছিল। আমার স্ত্রী অনিতা অতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে সেগুলি ব্যবহার করত।

জিনিস দুটোর দাম দশ হাজারের কম কিছুতেই নয়। অথচ এত দামী যৌতুক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কন্যাশঙ্কের একেবারেই ছিল না। কাজেই এষ্ট মহামূল্য অলঙ্কারগুলি আমাদের বাড়ীর সকলেরই মনে বিদ্বেষের হিমালয় রচনা করে তুলেছিল। সকলেই বলাবলি করত, “কথা না থাকলে এমন দামী গয়না কেউ কখনো দেয় নাকি।”

যুগ্মপথের বাজী

খঞ্জনপুরের ঘোষালরা অতি সম্ভ্রান্ত বংশ। নবাবী আমলে তাঁরা ছিলেন প্রকাণ্ড জমিদার—যদিও বর্তমানে তাঁদের ততবড় জমিদারী আর নেই; তবু ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে বনেদী বংশ বলে বিশেষ একটা খ্যাতির তাদের আছে।

আমি অনিতাকে বিয়ে করেছিলাম কেবল তাদের সেই বংশ-পরিচয়ে,—যৌতুকের লোভে নয়। কারণ, যৌতুক তাঁরা যা দিতে চেয়েছিলেন, তার দাম হুঁহাজারের বেশী মোটেই নয়।

কিন্তু হুঁহাজারের উপর আবার দশ হাজার টাকার গয়না! কাজেই সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছিল অনেক, কিন্তু সন্তোষজনক কারণের সন্ধান কিছুই পাওয়া যায় নি। এইটুকু শুধু জানা গিয়েছিল যে, ওই অলঙ্কারগুলি অনিতার শুভ বিবাহ প্রদত্ত তার ধর্মভায়ের প্রীতি-উপহার।

কিন্তু কে সে ধর্মভাই? কত বড়লোক সে? একটা ধর্ম-সম্পর্কের খাতিরে দশ হাজার টাকা যে উপহার-স্বরূপ দান করতে পারে, সে যে একজন কোটীপতি, তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু অনিতার কাছে জানলাম যে, সে ধনবান্ মোটেই নয়—সে একজন আশ্রয়হীন গরীব। চালচুলো তার কোথাও নেই। থাকে সে এখানে-সেখানে, বনে-জঙ্গলে, গাছতলায়,—তাও যে কখন কোথায়, কেউ তা বলতে পারে না।

হেঁয়ালী মন্দ নয়। কাজেই সেই অসাধারণ ধর্মভাষের পরিচয় পাওয়ার জন্তে ঔৎসুক্য হয়েছিল খুবই। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও তার নামটি ছাড়া অনিতার কাছে আর বেশী কিছু পাওয়া গেল না। শুনলাস, তার আসল নামটা বোধ হয় আজকালকার

স্বত্বপাথের যাত্রী

কেউই জানে না।—অনিতাকেও নয়। তবে “দয়াল দাদা” নামে সে বন্ধ, বিহার, উড়িষ্যা, এমন কি ভারতবর্ষের অগ্র অনেক স্থানেও সুপরিচিত—বিশেষ করে সেই সব দেশের যত দীন-দরিদ্র, অসহায় ও হুঃস্থ উৎপীড়িত লোকদের কাছে।

বিস্ময় বাড়লো বই কমলো না। উপরন্তু একটা দারুণ অমুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো এই রূপকথার অপকৃপ চরিত্রটাকে কেন্দ্র করে। স্থির করলাম, জানতেই হবে কে সেই অদ্ভুত লোক, যে বাস করে বনে-জঙ্গলে, গাছতলায়—তাও কখন যে কোথায়, কেউ তা জানে না—বিলোয় হীরে, মানিক, রত্নরাজি! দেশ-বিদেশে সুপরিচিত, অথচ কেউ জানে না সে লোকটা কে?

বি, এ, পরীক্ষা দিলাম বিয়ের মাস চারেক পরেই। তারপর দেশ-ভ্রমণের ছল করে বেরিয়ে পড়লাম দয়াল দাদার অমুসন্ধান করতে। অমুসন্ধানের কথা কাউকে জানতে দিলাম না,—অনিতাকেও নয়।

মুখাপথের যাদী



“মা উঠুন। ভয় কি ?

২২

প্রথমেই গোলাম খজনপুর। শওরালয়ে প্রবীণ পুরুষ কেউই নেই। বিধবা স্বশ্রমাতা ঠাকুরাণীই সংসারের অভিভাবিকা। স্পষ্টভাবে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নি। তবুও প্রকারান্তরে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিলাম।

প্রশ্নটি শোনবাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটি গম্ভীর হয়ে এক অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠলো। দেখলাম এক পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তি! সম্ভানের শুভকামনার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাতৃ-আশীর্বাদের পূর্ণ কপ তাঁর চোখে ও মুখে ফুটে উঠেছে।

অল্পক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থেকে তারপর ধীরে ধীরে কোমল উপদেশের সুরে তিনি উত্তর দিলেন :

“বাবা! তুমি ছেলেমানুষ। লেখাপড়া শিখেছ—তাই কবে যাতে দশজনের একজন হতে পারো, তারই চেষ্টা করে যাও। ওসব খরছাড়া, পথহারা লোকের পরিচয় জেনে তোমার উপকার কিছুই হবে না। দয়াল যেমনই হোক, সে আমার ধর্মছেলে; কিন্তু আমার নিজের ছেলে থাকলেও দয়ালের চেয়ে সে বোধ হয় আমার বেশী প্রিয় হ’তো না।

চৌদ্দ বছরের সেই হতভাগ্য ছেলেটিকে তার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচার করে তাড়িয়েছে, জ্ঞাতিরা উৎপীড়নের অন্ত বোধে নি, দেশের লোকেরাও অবিচার করেছে যতদূর সম্ভব।

গাঁহুঘের সমাজে ঠাঁই তার মেলে নি, তাই প্রাণের জ্বালায় ছুটে

যুগ্মপথের যাত্রী

বেরিয়েছিল সে অনির্দিষ্টের পানে। স্নান করতে গিয়ে আমাদের গ্রামের পাশের নদীর তীরে একটা তালগাছের তলায় তাকে পেয়েছিলাম মরণাপন্ন অবস্থায়।

ছ'বছর সে ছিল আমার কাছে, আমার ছেলের স্থান অধিকার করে। সেই অল্প কয়টি বছরেই মায়ের চোখ দিয়ে দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, দয়ালু আমার সাধারণ ছেলে নয়। তার ভেতর একটা অতি-মানুষের মহাপ্রাণ কোনোরকমে আত্মগোপন করে আছে। আমার কাছে এই সব সাধারণ বাঁধনে বাঁধা পড়তে সে আসে নি—বাঁধা সে থাকবে না। তার ভেতরকার অতিমানুষটি একদিন না-একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তাকে কোথায় কোন তেপান্তরের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

হলোও তাই। কুড়ি বছর বয়সে, যেমন অতর্কিতে সে এসেছিল, তেমন অতর্কিত ভাবে চলে গেল। সে আজ ৯১০ বছরের কথা। সেই থেকে আমরা তার কোন সন্ধান পেতাম না বটে, কিন্তু আমাদের সকল খবরই সে রাখতো।

এ কথাটা জানলাম আজ হতে বছর-সাতেক আগে। ওঃ! সে কি এক ভীষণ দিনই গেছে! আমাদের পরম শত্রু গোবিন্দলাল আমাদেরই যথাসর্বস্ব অপহরণ করে হয়ে উঠেছে একজন মহা ধনবান লোক—তবু আমাদের উপর আক্রোশ তার মেটে নি।

অনেক টাকা ব্যয় করে সে একটা প্রকাণ্ড গুপ্তার দল তুলেছিল আমাদের সর্বনাশ করতে। সেদিন অমাবস্যা—আকাশ-জোড়া জমিট মেঘের নীচে পৃথিবীর বুক কাকের প মত কালো হয়ে উঠেছে। তার উপরে টিপ্, টিপ্ করে

মৃত্যুপথের বাড়ী

পথে, ঘাটে, লোকের বাড়ীতে মানুষের সাড়া-শব্দ একেবারেই নিভে গেছে। ছপুর রাতে হঠাৎ কি চীৎকার! আর কি ভয়ানক দরজা ভাঙ্গার দমাদম শব্দ। “রে রে রে, মার মার” প্রভৃতি হুঙ্কার শুনে সকলেরই গায়ের রক্ত জল হয়ে আসতে লাগলো। ভাবলাম—ডাকাতের হাতেই বুঝি আমাদের ধনপ্রাণ তুলে দিতে হবে!

অনিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা ছোট ঘরের অন্ধকারের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম...কতক্ষণ তা জানি না। হঠাৎ একটা “মা! মা!” ডাক কানে যেতেই চৈতন্য ফিরে এল। চোখ চাইতেই দেখলাম, আমার সেই ঘরটা একটা জ্বলন্ত মশালের আলোয় আলো হয়ে উঠেছে, আর সেই আলোয় আমার ঠিক সমুখেই এক অপূর্ব সাজে সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সেই ধর্ম্মছেলে।

দয়ালের কোমরে একটা গাঢ় লাল রঙের জাম্বিয়া আঁটা, মাথায় একটা চক্চকে লোহার গড়া পাগড়ী, কোমরে প্রকাণ্ড একটা ছোরা আর ডান হাতে বর্শা। হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে সে বললে,—

আ “মা! উঠুন। ভয় কি? আপনার দয়াল বেঁচে থাকতে বেশীনার ওপর অত্যাচার করে বেঁচে যাবে এমন দশটা মাথা আছে। গোবিন্দলালের অর্দ্ধেক দল সাবাড় করে দিয়েছি, অর্দ্ধেক স্বজ্ঞেই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। এখন একবার উঠুন মা! অনেক-নি, ঠাণ্ডে আপনাকে একটা প্রশ্রাম করি।”

ম্মালকে দেখে আর তার কথা শুনে মরা দেহে যেন জীবন

যুত্পাথের বাতী

ফিরে পেলাম, কিন্তু বিস্ময় বেড়ে উঠলো খুবই। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতখানি সম্মুখে ধরে জিজ্ঞেস করলাম—

“এ কি! দয়াল? সত্যিই তুই? এতকাল পরে হঠাৎ এই বিপদের সময়ে কোথা হতে এসে পড়ালি বাবা? গোবিন্দলালের কথাই বা কি বলছি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা!”

দয়াল হাসলো। বললো :

“বুঝবেন কি করে মা! এত সব বড়্যন্তের কথা আপনার বুঝা অসাধ্য, কিন্তু তবু এইটুকু জেনে রাখুন—আজকের এই ভয়ানক আক্রমণ সেই গোবিন্দলালেরই কীর্তি। গুণ্ডাব দল জুটিয়ে এসেছিল আপনাকে আর অনিতাকে খুন করতে। কিন্তু সে হতভাগা জানে না যে, দম্মা-সর্দার তেজশঙ্করের চর সর্বত্রই আছে। তার চোখে ধুলো দেওয়া মানুষের সাধ্য নয়।”

বিস্ময়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দয়াল বলে কি! সে কি তবে দম্মার দলে নাম লিখিয়েছে? সে কি সেই বিখ্যাত ডাকাতের দলভুক্ত? ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম :

“তেজশঙ্কর? সেই নামজাদা ডাকাত-সর্দার? কি বলছি? তুই দয়াল? সেই ডাকাতের দলই কি আমাদের আজ বাঁচালে?”

দয়াল এবার খিল খিল করে হেসে উঠলো। উত্তর করলে—
“হ্যাঁ, মা। সে আজ নিজে এসেছে তার কথারিৎসু ঋণ শোধ করতে। পাণ্ডা গোবিন্দলালের মুণ্ডটা সে নিজের হাতেই তার ধড় থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আপনার উপর আর কোন অত্যাচার সে

মৃত্যুপথের যাত্রী

করতে পারবে না। এখন বলুন মা! তেজশঙ্করের মাতৃস্বপ্নের এক কণাও কি এতে শোধ হয় নি?”

কি উত্তর দেব, তা বুঝতে পারলাম না; কারণ, তার কথাগুলো তখনও আমার মনে হচ্ছিল যেন হেঁয়ালী! শেষে সে-ই অল্প ছুঁচর কথায় আমার সন্দেহ মোচন করে দিলে। তারপর আমাকে প্রণাম আর অনিতাকে আশীর্বাদ কবে ঝড়ের মত সে উধাও হয়ে গেল!

সেই থেকে আজ পর্যন্ত তার আর সাক্ষাৎ পাঠি নি। কিন্তু তার অন্তত কীর্তির কথা নিত্য-নতুন বর্ণনার রূপ ধরে সারা দেশবাসীর ও সেই সঙ্গে আমারও কানে এসে বাজছে। সবাই সমস্বরে বলছে— তেজশঙ্কর একটা মহাপাপী, তেজশঙ্কর খুনে, তেজশঙ্কর নব-সমাজের মহাশত্রু। কিন্তু আমার সেই ধর্ম্ভেলে দয়াল দেশ-বিদেশের দীন, দরিদ্র, অনাথ, অসম্মানিত আর অত্যাচার-পীড়িতদের ‘দয়াল দাদা’ হয়ে হাজার হাজার লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি আর আশীর্বাদ কুড়িয়ে নেড়াচ্ছে, এ কথা কেবল আমিই জানি।

অনিতা মিথ্যে বলে নি বাবা! আমিও শপথ করে বলতে পারি যে, তার কথার একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। দয়াল যাই করুক, সে নিজের জন্ত কিছুই করে না। সে নিজে যেমন হতভাগা ছিল, ঠিক তেমনিই আছে। আগেকার মত আজও মানুষের সংসারে তার ঠাঁই নেই—দেশের লোকের ঘরে তার আশ্রয় নেই। বরং মানুষ-সমাজের দৃষ্টি এড়াবার জন্তে বনে ও জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়ায়—তাও একস্থানে স্থির হয়ে সে থাকতে পারে না। ভোগ নেই, বিলাস নেই, আরাম-বিশ্রামও তার ভাগ্যে কখনো জোটে না, তবু সে হাজার হাজার

মৃত্যুপথের যাত্রী

লোকের দয়াল দাদা—সে দীন-দুঃখীর মা-বাপ। শুধু এইটুকু জেনে আমি তার সব অপরাধের কথা ভুলে গেছি, তাকে ঠিক আগেকার মত স্নেহের চোখেই দেখে আসছি। অপরাধের মধ্যেও—সে মহৎ, সে মহানুভব।

সে আমাব ধর্ম্যছেলে, তবু তার সঙ্গে আমাদের কোন রকম সংস্রবের কথা প্রকাশ করবার নয়। তুমিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিজ্ঞেস না করলে তার কথা কিছুই জানতে পারতে না। এখন যেটুকু জানলে, তাও আমাদের সকলেবই জ্ঞাতো তোমাকে গোপন করতে হবে। প্রথমেই তাই বলেছিলাম যে, সে একটা ঘরছাড়া, পথহারা লোক। তার কথা জানবার চেষ্টা না করে তোমার পক্ষে নিজের কাজ করে যাওয়াই কর্তব্য।”

স্বশ্রামাতার সব কথা শুনে আমাবও যেন কেমন একটা শ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল দয়াল দাদার উপর। লোকটা তা হ’লে বাস্তবিকই অতি অসাধারণ। কিন্তু কেমন করে সে সেই হীন অবস্থা থেকে এতবড় একটা দস্যু-সর্দার হ’য়ে উঠলো, তা আমি কিছুতেই ধারণা করে উঠতে পারলাম না। আরও বুঝতে পারলাম না যে, তার এই নৃশংস দস্যুতার উদ্দেশ্য কি! সত্যই কি সে এমন অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চক? সত্যই কি সে আপন ভোগসুখের প্রতি এমন উদাসীন? কেবল মাত্র দেশের দীন-দুঃখীদের সাহায্য করবার জ্ঞেই কি সে ধনিক সম্প্রদায়ের বিকক্ষে এতবড় অগরাধ দীর্ঘকাল ধরে করে আসছে?

যা হোক তখনকার মত দয়ালের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানবার কৌতূহলকে দমন করতে হ’লো। দেশবিখ্যাত দস্যু-সর্দার

যুত্মপথের যাত্রী

তেজশঙ্করই যে সেই দয়াল দাদা, একথা শোনবার পর কারই বা সন্ধ্যা হ'তে পারে -তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে বেড়াতে ? সরকারের বিরাট পুলিশ-বিভাগ যে-কাজে হার মেনেছে, আমার মত একটা নগণ্য লোকের সাধ্য কি যে, সে-কাজে এক পাও এগোয় ? কাজে-কাজেই স্বশ্রমাতার উপদেশ মেনে নিয়ে নিজের কাজে মন দিতে হ'লো ।

এর ছ'বছর পরেই ঢুকলাম চাকরীতে । পুলিশ-বিভাগে মাথা গলিয়েই পদোন্নতির পর পদোন্নতি । শেষে আরও ছ'বছর যেতে না যেতেই হয়ে গেলাম এলাহাবাদ সেন্ট্রাল জেলের 'জেলার' ।

দিন যায় । দেখতে দেখতে আমার চাকরীর চার বছর হয়ে গেল । এর মধ্যে তেজশঙ্করের অনেকগুলো লোমহর্ষণকর নৃশংস ডাকাতি আর নরহত্যার কাহিনী আমার কানে এসেছিল । মারা দেশের ধনিক মহলে পড়ে গিয়েছে একটা মহা আতঙ্কের সাদ্রা । পুলিশ-বিভাগের বড় বড় কর্মচারীদের চক্ষু একেবারে ঘোলাটে হয়ে গেছে ! তারা না পারে কোন বিছু বিনারা করতে, না পার কৈফিয়ৎ দিতে ।

এদিকে ছোট-বড় সব রকমের খবরের কাগজগুলিতে জ্বালাময়ী ভাষায় তুফান বয়ে গেল ! যতই বড় বড় লোকের হত্যাকাণ্ড ঘটে, ততই তাদের আশ্ফালন বেড়ে যায় । বড় বড় শব্দ আর লম্বা লম্বা বক্তৃতার সাহায্যে তারা প্রত্যেক বীভৎস ঘটনাকে শতগুণ বীভৎস করে তোলে, আর সেই সঙ্গে পুলিশ আর সরকারকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অস্তিত্ব করে দেয় !

রংপুরের রাজা-উপাধিধারী জমিদার দুর্গাশঙ্কর চৌধুরীর হত্যা,

মৃত্যুপথের বাতী

ময়ূরভঞ্জন কোটীপতি মহাজন হরদেওলাল গিধাড়িয়াকে খুন
তার পঞ্চাশ হাজার টাকা লুট প্রভৃতি গোটাকতক বড় বড় ^{কেনে}
নিয়ে শুধু সংবাদপত্রওয়ালারা কেন, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ^{ফার}
জনসাধারণ এবং সেই সঙ্গে পুলিশ-মহলের পর্যাস্ত আহা-নিজ্ঞ,
একরকম ঘুচে গেল !

আমি নিরীহ মানুষটির মত জেল সীমানার মধ্যে থেকে জেলের
ওয়ালার আব কয়েদীদের নিয়ে ডিউটি বজায় রাখি আর শুনে যাই
দয়াল দাদার নিত্য-নূতন নৃশংসতার কাহিনী।

ভাব, কি আশ্চর্য্য তাব শক্তি ! কি অদ্ভুত সাহস ! লোকটা
শুধু দম্ভ নয়—সে বোধ হয় একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন
যাছুকর। নইলে এত দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের নানা স্থানে এমন
অত্যাচার কবেও নিজের দলবল নিয়ে সে এমন নিখোঁজ ভাবে
আত্মগোপন করে থাকে কি প্রকারে ?

অবশেষে সরকার বাহাদুরের টনক বেজায় রকম নড়ে উঠলো।
গু. স. ৩০, আই, ডি, মহলে লেগে গেল থরহরি কম্প। চারিদিকে
পড়ে গেল সাজ্, সাজ্, রব। হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণাও
হয়ে গেল। ধরপাকড় আর খানাতল্লাসী শুরু হলো একদম
বেপয়োয়াভাবে।

প্রত্যহ দলে দলে লোক আসামী-সন্দেহে ধৃত হয়ে নানা
জেলের হাজত-ঘরে পচতে লাগলো। পুলিশের সন্দেহ যে, তারা
তেজশক্তির গুপ্তদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, না হয় তারা দম্ভাদলের সব
তথ্য জেনেও গোপন করে যাচ্ছে।

তাদের মধ্যে অধিকাংশ গরীব চাষী, মজুর বা নীচ জাতীয়

মৃত্যুপথের যাত্রী

তেজ। বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, সাঁওতাল, বুনো—সব ভাবে ধরা পড়ে হাজত-ঘরে এসে বস্ত্রপটা হতে লাগল। স্ত্রীরপর আরম্ভ হ'ল, স্বাকারোক্তি আদায়ের জন্তু নানা রকম চেষ্টা! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিছুতেই তাদের কাছ থেকে তেজস্কর বা তাব দলের কোন খোঁজ-খবরই পাওয়া গেল না। তাদের কাছ থেকে এটুকু শুধু জানা গেল যে, তারা দম্যপতি তেজস্করের কিছুই জানে না, কিন্তু দয়াল দাদাকে মৃত্তিমান্ করুণার অবতার বলেই তাবা মনে করে।

দয়াল দাদা তাদের দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, বিপদের বন্ধু, তাদের সকলেরই মা বাপ। দয়াল দাদা কোথায় থাকে, কি করে, তা তারা জানে না, তবু বিপদ আপদের সময়ে তার সাহায্য আসে ঠিক দেবতার দানেবই মত। দয়াল দাদার অপূর্ব দানশীলতা না থাকলে অজন্মায়, দুর্ভিক্ষে, জমিনারের অত্যাচারে ও অন্ত্র অনেক বিপদ-আপদে গরীব দুঃখী লোকদের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে ঝাঁড়াতো।

জেলখানার নানা কষ্ট ও মানসিক দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে, বন্দীদের কেহ কেহ মরেও গেল; কিন্তু তবু দম্য-সর্দার তেজস্কর বা তার দলবলের সম্বন্ধে এ কথাও কেউ বল্ল না।

কে জানে, তার কারণ কি? প্রকৃতই অজ্ঞতা,—না কৃতজ্ঞতা?

তিন

বুঝলাম দয়ার অবতার দয়াল দাদার কি অসামান্য প্রভাব
এই সব দীন-দরিদ্র, অসহায় হতভাগ্যদের উপর। অথচ দেশের
অত্যাচারী ধনিক সম্প্রদায় তার নামে থরহরি কম্পমান! দম্ভাব
ছদ্মবেশে এ তবে কেমন লোক?

তেজশঙ্করের সম্বন্ধে তাই একটা উৎকট অনুসন্ধিৎসা জেগে
রইলো আমার মনে। লোকটা অসাধারণ অনেক বিষয়েই, কিন্তু
সে তার অসামান্য দক্ষতা আর মনোভাব নিয়ে এমন ঘৃণিত পথটাই
বা বেছে নিলে কেন? হৃদয়ের বিরাট প্রসারতা নিয়ে এমন
হৃদয়হীনতার কাজ যে করে যেতে পারে, তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য
কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলুম না।

যাক। ধরপাকড়, জুলুম সমান ভাবেই চলতে লাগলো।
আসল ডাকাতির সন্ধান না পেয়ে, দলে দলে নকল ডাকাতদের
চালান দেওয়া হতে লাগলো, তেজশঙ্করের দলস্থ লোক বলে।
দেশে-দেশে গরীব, দুঃখী, চাষী, মজুর আর বেকারদের মহলে
হাঠাকার পড়ে গেল।

এর পরেই হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্য ব্যাপার! দেশবিদেশের
জনসাধারণ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে
বড় বড় হরপে ছাপা হয়ে বেরুলো এক অভাবনীয় সংবাদ!
পুলিস-মহলের কি ব্যস্ততা! কি হুলস্থূল! সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গীনের
খোঁচার মত আমার কানে এসে বাজলো দস্যু সর্দার তেজশঙ্করের
ধরা পড়বার সংবাদ।

বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হ'লো এটা কাগজ-
ওয়ালাদের কারসাজি। তেজশঙ্কর ধবা পড়বে? পুলিশের পক্ষে
এতবড় একটা অসাধ্যসাধন কি সম্ভবপর?

সন্দেশের মীমাংসা হয়ে গেল ঠিক পরদিনই। বিশ্বস্ত-সূত্রে
জানলাম যে তেজশঙ্করকে ধরার সৌভাগ্য কারও হয়নি। সে
নিজেই এসে ধবা দিয়েছে জেলাব মাজিস্ট্রেটের কাছে। বহুসংখ্যক
নিরীহ লোককে পুলিশের অযথা অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যেই
নাকি তার এই আত্মসমর্পণ।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দশু-সর্দারের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা
নীচু হয়ে পড়লো। স্বর্গমাতার সেদিনেব সেই কথাগুলি ছাপার
অক্ষরে আমার চোখের সম্মুখে যেন ফুটে উঠলো—“অপরাধী সে
হতে পারে;—তবু তার সেই হাজার অপরাধের মধ্যেও সে মহৎ—
সে মহানুভব।”

সেই তেজশঙ্কর! সেই আমার স্ত্রী অনিতার দয়াল দাদা—
আমার পূজনীয়া স্বর্গমাতা ঠাকুরাণীর ধর্ম্যছেলে দয়াল!

যাহোক্ সুদীর্ঘকাল মামলা চলবাব পর দশুসর্দার তেজশঙ্করের
একটা যবনিকাপাত হয়ে গেল। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হ'ল—
এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের শেষ বিচারেও তার সাজা অক্ষুণ্ণ রয়ে
গেল।

তেজশঙ্করের ফাঁসি হবে—কাল সেট ফাঁসির তারিখ। ফাঁসির
প্রত্যাশায় সে আমাদেরই এই হেলের লোহাঘরা হাজত-ঘরে বন্দি
হয়ে আছে।

হাতে হাতকড়া, পায়ে লোহাব বেড়ী আর কোমরে লোহাব

মৃত্যুপথের বাতী

শিকল পরা, চার-পাঁচজন সঙ্গীন্দ্রবাহী প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় প্রথম যে দিন তাকে এই জেলে আনা হ'লো, সেইদিনই তাকে দেখে আমি যারপরনাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

একি ! এই সেই দসু-সম্রাট ? ফুটফুটে গৌববর্ণ, লম্বা-চওড়া চেহারা, বিশাল বক্ষ, পেশীময় বাহু, প্রশস্ত ললাট আর টানা টানা বড় বড় ছুটি চোখ—কোন রাজা বা বাজপুত্রেরও এমন সুন্দর আকৃতি হয় কিনা সন্দেহ !

কঠিনতম অপরাধের আসামীস্বরূপ লোহার বাঁধনে বদ্ধ হস্তপদ অপরিহার্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'বাব জন্তে হাজত ঘরে যাকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, তার উদ্বেগশূন্য প্রশান্ত মুখশ্রী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। জেলের ভয় সবার হয়তো নাও থাকতে পারে, কিন্তু চরমদণ্ড ফাঁসি তার একমাত্র সুবিচার তা জেনেও এমন অনুদ্বন্দ্ব এমন অবিচলিত কেউ থাকতে পারে, সে কথা তখনও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

শুনলুম হাইকোর্টের বিচার শেষ হয়ে গেলে, জজ সাহেব গম্ভীর স্বরে আসামীকে যখন তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনিয়ে দিলেন, তেজস্বেয় তখনও নাকি একদম পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখেব সুন্দর রঙ একটুও বিবর্ণ হয়নি। একটা রেখাও ফুটে ওঠেনি তার কপালে। যেন তার কাছে মৃত্যুদণ্ড একটা দণ্ডই নয় ! সে যেন একটা ছেলেখেলা।

বিচার শেষে তাকে যেদিন জেল-হাজতে ফিরিয়ে আনা হয়, আমি সেদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায়

মৃত্যুপথের যাত্রী

তাকে আমি বলেছিলাম, আমার খঞ্জনপুরের খুশুবালায়ের কথা। আমি যে অনিতার স্বামী সে কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তার বড় বড় চোখ ছোটো একবার ক্ষণেকের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠে আবার পূর্বের মত স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু সে তাতে কোন উত্তর দিলে না।

আমি অনেক কথাই বলে গেলাম। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তা'র অপূর্ব আত্মত্যাগ, আর সেই বাবণে সরকার তবফের লোক হয়েও তা'র প্রাতি আমার অসম শ্রদ্ধা। সব কথা অকপটভাবে বলবার পর আমি তাকে অনুরোধ করলাম তার অপূর্ব জীবনচরিত আমাকে শোনাতো।

সাধারণ গৃহস্থের ছেলে হয়ে, কেমন করে, কিসেব জন্তু সে এই দুর্গম পথের যাত্রী হয়ে পড়লো, আর কোন বিচারই বা সে দেশের ধনিক মহলেব সর্বনাশ করে, অসভ্য, অশিক্ষিত, দীন-দারদ্রের যথাসাধ্য পোষণ হবে যেত; আর সবশেষে এই তরুণ বয়সে স্বেচ্ছায় সরকারের হাতে আত্মসমর্পণ করে এমন ভাবে সে তার জনের মৃত্যুই বা ডেকে আনলে কেন, এইসব অনেক কথাই আমি তার কাছে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

স্থিরভাবে আমার সব কথা শোনার পর একবার সে একটু মুচুকে হাসলে। তারপর বলল :

“বুঝেছি তোমার আগ্রহটা সত্যিকারের। আমার সব কথা জানায় যদিও তোমার কোন উপকার নেই তবুও তোমার এমন একটা ঐকান্তিক আগ্রহকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না।

অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই তার এ অন্ত্রবোধ আমি মানতাম না। কিন্তু তুমি অনিত্য স্বামী—আমার পর নও।

মরতে আমি চলেছি। আমার অপরাধের চরমদণ্ড ফাঁসিই আমার যোগ্য মৃত্যু। এ মরণ আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিচ্ছি—কাবণ এ মরণই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

আমার জীবন-রহস্য তোমার কাছে কোতূহলের বিষয় হলেও তা তোমার শ্রুতি-মধুর হবে না। তবু যখন আগ্রহ তোমার হয়েছে—বেণ তা হলে আজ নয়—কারণ, আমার জগতের সব সম্পর্ক কাটিয়ে চলে যাবার এখনও কয়েকটা দিন দেবী আছে।

আমার ফাঁসির দিন ২৪শে এপ্রিল। তার আগের ১৮ দিন রাতেই আমি তোমার সব কোতূহল মিটিয়ে দেব। ২৩শে এপ্রিল বাত হুপুরেই আমি আমার জীবন নাটকের যবনিকা তুলে ধরবো তোমার চোখের স্মৃতিতে। তাতে তুমি সন্তুষ্ট হও—বেশ।”

হাজ সেই ২৩শে এপ্রিল। আমি ছপুর রাতের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ চুপ করে পড়ে ছিলাম অফিস-ঘরে একটা আরাম কেরার উপরে। বারোটা বাজতেই আমি ধীরে-ধীরে উঠে পড়লাম। তাবপব হেলথানার ভিতরে ঢুকে, চললাম ভেজস্করের হাঙত-ঘরের দিকে।

দোতলার ঠিক মাঝখানটিতে মোটা মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া অনতিপ্রসন্ন একটা ঘর—লোহার গরাদেগুলোর স্মৃতিতে আমার একপ্রস্থ ‘কোলাপ্‌সিবল্’ গেট! হাজত ঘরটি এত সুদৃঢ়

মৃত্যুপথের যাত্রী

থাক। সন্তোষ তেজশঙ্করকে মত অনাধারণ আসামীকে তাব মধ্যে আটক রেখে নিশ্চিত থাকা চলে না। উপরওয়ালাদের আদেশে তার বন্ধদ্বারের সম্মুখে তাহ একটা সঙ্গীনধারী প্রহরীকে মোতায়ন থাকতে হয়েছে।

লোহার ছায়া খুলয়ে বরাবর তাব ভিতরে গিয়ে ঢকলাম। তেজশঙ্কর মেঝেতে লম্বা হ'বে শুয়ে ছিল। আমি যেতেই সে উঠে বসলো। আমার আদেশে প্রহরী একটা পাঞ্চ-লাইট এনে গেটের সম্মুখে রাখলে। ঘাবের ভিতরটাও তাতে বেশ আলো হয়ে উঠলো। কয়েদীদের ব্যবহৃত একটা কঞ্চল মেঝেয় পেতে আমি দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম।

তেজশঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বইলো। তার বড় বড় চোখজুটিতে দম্ভাব কদ্রভাব একেবারেই নেই। কি প্রশান্ত, কি অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি! আমার বোধ হলো যে, সে আমার অন্তবেব অন্তস্তলটি পর্যন্ত লক্ষ্য কবে দেখছে যে সেখানে কৃত্রিমতা বা ছলনা কিছুমাত্র আছে কি না।

বোধ হয় সে আমার ভিতবে আপত্তিজনক কিছুই দেখতে পারেনি, সম্ভবতঃ সে আমার আনুগত্যে কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি। কারণ, পরক্ষণেই তাব মুখটি বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠলো। কোন রকম ভাণ্ডা না করাই সে তার অদ্ভুত জীবনচরিত বলে যেতে লাগলো বেশ ধীর আর গম্ভীরভাবে। আমিও একমনে তাই শুনতে লাগলাম।

চার

তেজশঙ্কর বলতে লাগলো :

বাংলার মধ্যে শক্তিপুর একটা গণ্ডগ্রাম। গ্রামটা বেশ বড় বলে ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান মিলিয়ে প্রায় আড়াই-শো ঘর লোকের সেখানে বাস।

গ্রামের মধ্যে আমরা খুব পুরোণো বংশ—যদিও ঘরোয়া বিবাদের ফলে “ভাই ভাই, ঠাই ঠাই” হওয়াতে বর্তমানে আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে কারও অবস্থা তেমন ভাল নয়। তবু বনেদী বংশ বলে গ্রামে আমাদের একটু খ্যাতি আছে।

আমার বাবা ছিলেন ভারী একগুঁয়ে প্রকৃতি আর চড়া মেজাজের লোক। সেই জন্যে গ্রামের অনেকেরই সঙ্গে তাঁর মোটেই বনতো না। ঠিক একঘরে না হ’লেও, পল্লীর গৃহস্থেরা আমাদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করত না।

আমি ছিলাম বাবার প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান। মা মারা যান আমার জন্মের পক্ষকাল পরেই। তারপর তিনমাস যেতে না যেতেই বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। কাজেই আমার সংমাকেই আমি জেনেছিলাম মা বলে।

শৈশবের কথা বিশেষ কিছু আমার মনে নেই, কিন্তু অল্প জ্ঞান হ’তেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার মা আমার উপর আদৌ সন্তুষ্ট ন’ন—তিনি বরং আমার ছোট বোনটিকেই ভালবাসেন খুব বেশী।

মৃত্যুপথের যাত্রী

দিনরাত তিনি তাকে নিয়েই ব্যস্ত এবং আমাকেও তিনি সর্বদা ব্যস্ত করে তুলতেন তার জন্ত। ক্ষিদের সময় ঠিকমত খাওয়া হতো। মিলতোই না, উপরন্তু কথায় কথায় ভংসনা আর শাসন করতেন পুরোমাত্রায়।

বাবা কোথায় কি কাজ করতেন জান না, তবে তিনি অধিকাংশ সময়ই থাকতেন বাগানে আর তাঁকে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হত। কর্মকান্ত দেহে ঘাবে ফিরলেই তাঁকে মায়ের কাছ থেকে কেবলই আমার বিরুদ্ধে অজস্র নালিশ শুনতে হ'ত।

বাবা প্রথমে কিছুকাল তাঁর অবিচলত ছিলেন, আমাকে ছু একটু গালমন্দ বলে চেপে যাবাব চেষ্টা করতেন। কিন্তু ক্রমাগত নালিশের ফলে তাঁর স্নেহশীল মনটা অবশেষে অনেক পরিমাণে বিগড়ে গেল। কাজেই তাঁর কাছেও আদরের পরিবর্তে অনাদরের ভংসনা সইতে হতো রোজই।

এইভাবে শৈশব থেকেই আমি স্নেহের আশ্বাদ থেকে বঞ্চিত হলাম। অথচ আমার আর আমার সেই একটুখানি বোনটির প্রতি বাবা ও মায়ের ব্যবহারের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করতে পারতাম। তার নানারকম আদর ও যত্ন আর আমার নিত্য নানা দোষদর্শন, তান্দ্রা, অযত্ন ও কথায় কথায় অনাচার-দণ্ড শৈশব হতেই আমার মনের আলোর রেখাগুলো এক এক করে মুছে দিয়ে তার জায়গায় অন্ধকার এনে ভরে দিতে শুরু করলে।

শিশুর জীবনটি যে কেবল শাসন আর তান্দ্রা, তাতে আনন্দ পাওয়ার মত কিছুই নেই, আছে শুধু পদে পদে কত কি অজানা বিপদের ভয়, এইটুকু উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আর মায়ের

উপর আমার ভালবাসার টান বলতে তো কিছুই রইলো না, অধিকন্তু তাঁরা হয়ে উঠলেন আমার কাছে মহা ভয়ের বস্তু ।

পাঁচ বছর পূর্ণ হবার পর হ'তেই পাঠশালায় যেতে শুরু করলাম । কিন্তু সে যাওয়া কেবল একটা নিয়ম রক্ষা করা মাত্র । পড়াশুনার সময় বা সুবিধা মিলতো না বলে পড়া তৈরী আমার কোন দিনই হ'ত না ; কাজেই কড়া শাসন সেখানেও আমার নিত্য সঙ্গী হ'য়ে উঠলো ।

আগে শুধু ছোট বোনটি ছিল আমার নানা কষ্টের কারণ । কিন্তু পাঠশালায় ভর্তি হবার ঠিক পরেই আর একটি ভাই এসে উদয় হ'লেন আমার নিগ্রহ বাড়াতে । সবে পাঁচ-ছয় বছরের বালক হ'লেও, আমারই স্বন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হ'লো সেই একটুখানি শিশুর পাহাড়-প্রমাণ ভার ।

তাকে চৌকি দেওয়া, কোলে নেওয়া, কান্নার সময় ভোলানো, সামলানো—এমন কি অনেক ঘৃণ্য বা আপত্তিজনক কাজও আমার কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়ালো । বোনটির ভার তো আছেই ! ফলে পাঠশালার পড়া তৈরী করা আমার দ্বারা আর হয়ে উঠতো না ।

ভাগ্যগুণে আমাদের গুরুমশাইটিও ছিলেন একজন কসাই-বিশেষ । তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জটিলতা দেখে, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি তাঁর মধ্যে বাসা বাঁধতে সাহস করেনি । তাঁর আগ্রহ বিলক্ষণ প্রকাশ পেতো পড়ুয়াদের নিগ্রহের বেলায় । কাজেই পড়ানোর চেয়ে পেটানোর কাজটাতেই তিনি ছিলেন অশেষ দক্ষ ।

বাড়ীতে পড়া তো হ'তেনি না—খাওয়াও জুটতো না সব দিন,

মৃত্যুপথের ঝাড়ী

অবশ্য বকুনি, খিঁচুনি, আর চড়-চাপড় ও কাণমলা ছাড়া ; কাজেই কাঁদতে কাঁদতে আর চোখ মুছতে মুছতে অহুত অবস্থায় যেতে হ'তো পাঠশালায়। সেখানেই বা পড়া না হওয়ার কৈফিয়ৎ শুনবে কে ? কাজেই খেজুর-ডালের ছড়ি আর কাঁচা কঞ্চির দাগে পিঠ আর কাঁধ ভরিয়ে নিয়ে ক্ষিদে-তেষ্টার কথা ভুলে যেতে হতো।

তাতেই বা নিকৃতি কই ? পড়াশুনায় অমনোযোগের অভিযোগ বাবার কানে উঠতো প্রায়ই। আসল কর্তব্যে কিছুমাত্র লক্ষ্য না থাকলেও অভিভাবকদের কাছে পড়ুয়ার অবহেলার অভিযোগ করাটি গুরুমশাই তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাতে তাঁর সুনাম-বৃদ্ধি তো হ'তোই সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকেরাও তাঁদের ভেলেদের প্রতি মনোযোগী হ'য়ে ওঠবার সুযোগ পেতেন।

গুরুমশাইয়ের নালিশ শুনে বাবা প্রথমে কয়েকটা দিন আমাকে খুব ভৎসনাই করেছিলেন, আর বেশীদূর এগোননি। কিন্তু আমার বিমাতা তাঁকে ক্রমশঃ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে, আমি একটা মহা অবাধ্য, অকর্ষণ্য, আর বেজায় হিংস্রটে ছেলে। আমার গুণ বলতে কিছুই নেই—আছে কেবল নানা দোষ আর রাফসের দৃষ্টি। পড়ায় আমার মন নেই, চেষ্টা নেই, গ্রাহও নেই এতটুকু। আমি একটা কুলাঙ্গার। বংশের নাম ডোবাতেষ্ট আমি তাঁদের ঘরে এসে জন্মেছি। আমার নিত্যকার নানা হিংস্রটপনা আর শিশু ভাই-বোনদের উপর অত্যাচারের ফর্দ তিনি বেশ করে বাবার সম্মুখে দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

ক্রমশঃ বাবাও এতে বদলে গেলেন। তিনি অবাধ হয়ে যেতেন আর ভাবতেন—“তাইতো ! এই বয়সেই এমন ! এ

ছেলে বড় হলে হবে কি ? আমাদেরই বৃকে হয়তো কোনদিন এ ছুরি বসিয়ে দেবে। কি করা যায় একে নিয়ে ?”

কাজেই তাঁকে রীতিমত মনোযোগী হতে হ’তো আমার অমনোযোগ দূর করতে। ফলে ওই অল্প বয়সেই এক একদিন আমার প্রাণ-বিয়োগের উপক্রম হ’য়ে উঠতো।

শৈশব আর বাল্য এই ছোটো কালই প্রত্যেক মানুষের জীবনের আসল সুখের আর আনন্দের কাল। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, নিজের দিকে চাইবার কোন প্রয়োজন নেই। সে সবকিছু ভাবনার ভার বাপ-মায়ের—যাঁদের স্নেহ, যত্ন আর আদর না চাইতেই পাওয়া যায়—‘চাট না’ বললেও নিষ্কৃতি নেই ; যেন তা পেতেই হবে, পাওয়া চাই। চাওয়া আর পাওয়া তখন জোরের অধিকার। ‘চাই’ বললেই দিতে হবে, ‘পাইনি’ বললেই বাপ-মায়ের মনঃকষ্ট বাড়ে, তাঁদের শ্রায্য দেনা দেওয়া হয়নি বলে। পৃথিবীটা তখন তার জমিদারী। বাপ-মায়ের স্নেহই তার সে জমিদারী ভোগ করবার বিধিদণ্ড সনদ।

সে শৈশব বা বাল্য আমার জীবনে বোধ হয় আসেনি। সে অধিকার আমি পাইনি কোনদিনই। শাসনকেই আমি স্নেহ, আর তাড়না-ভৎসনাকেই যত্ন আদর বলে ভাবতে শিখেছিলাম। বাবা আর মায়ের সংস্রব মধুর ব’লে একদিনও আমার বোধ হয়নি। বরং তাঁদের দেখলেই আমার ভয় হ’তো পাছে আবার কোন অজানা অপরাধের জগ্নু নিগ্রহ সইতে হয়।

দোষ-গুণ কাকে বলে, ঠিক বুঝতে পারতাম না। যা কিছু করতাম, সবই হতো দোষের। কিছু না করলেও সেটা দোষের

মৃত্যুপথের বাড়ী

হয়ে দাঁড়াতে। তাই দোষগুণের বিচার করবারও প্রবৃত্তি আসতো না। নিজেকে সংশোধনের কোন ইচ্ছাই হ'তো না আমার মনে। জানতুম দোষ করবোই—তবে না করেই বা নিস্তার কই ?

মাঝে মাঝে ভাই-বোন দুটির সঙ্গে আমার নিজের অবস্থার তুলনা মনে জেগে উঠতো। তাদের আদর-আপ্যায়ন, তাদের প্রতি বাবা-মায়ের স্নেহ-যত্ন, আমার দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। বালক হ'লেও আমি তাতে হিংসা বোধ কখনো করিনি, কিন্তু তবু আমার নিজের ছোট্ট বুকটিতে বাথা যে বাজতো না, সে কথা বলতে পারি না। কষ্ট কিছু হ'তোই। কিন্তু গোপনে দু-একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি সে কষ্ট ভোলবার চেষ্টা কবতাম।

কিন্তু দোষ-গুণ বিচারের পার্থক্যটা আমার সহ্য হ'তো না। তারা বড় রকমের কিছু অন্যায় করলেও, মায়ের চোখে দোষ বলে তা ধবা পড়তো না। এমন কি তাদের অন্যায় কাজের দোষটাও চাপতো এসে আমার ঘাড়ে—অথচ আমি যে কখনো তেমন কাজ কিছু করেছি, সে কথা আমার মনেই পড়ে না।

ক্রমে যেন আপনা হ'তেই আমার মন একটু একটু করে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগলো। বাবা আর মাকে ভয় করতাম খুবই—কিন্তু সে ভয়ও যেন ক্রমেই কমে আসতে শুরু করলে। নিজের প্রতিটি আব গ্রাহ আসে না, তা ভয়কে গ্রাহ করবো কার জন্তে ? শাসনের সম্বন্ধ গায়ের সঙ্গে। গায়ের ব্যথার ভয়েই তাকে ভয়। শাসন গা-সওয়া হ'য়ে গেলে তাকে আবার ভয়টা কিসের ? শাসন যত বাড়়ে, ভয়ও তত কমে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও ততই বাপ-মায়ের উপরে তিক্ত হয়ে উঠতে লাগলো।

পাঁচ

বালাটাষ্ট মানুষের জীবনের মহা মূল্যবান কাল। ভবিষ্যৎ মনুষ্য বা পশুভেব বীজ মনের উর্বর জমিতে বপন করা হয় এত সময়েই। যেমন বীজ বুনবে, পরে ফল পাবে সেই মতই। কিছু না বোনো তো, জমিটা কাঁটা গুল্ম আর আগাছায় ভরে উঠবে। যে জমি যত উর্বর, স্রোতে ভাল বা মন্দ যেটাই জন্মাক, জন্মায় তা তত প্রচুর।

আমার মনটা উর্বর ছিল খুবই—কিন্তু অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, তাড়না আর ভৎসনা ছাড়া কোন ভাল ভাবের বীজ তাতে কেউ কোনদিন বুনলে না। স্নেহের স্বরূপ আমি কখনো বুঝতে পাইনি। দয়া, মায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি যে কি, তা নিজের বুক দিয়ে বোঝবার সুযোগ কেউ আমাকে দেয়নি। জীবনে যা কখনো পাইনি, তা নিজের প্রাণের তহবিলে সঞ্চয় করি কি করে? কাজেই প্রাণটা যতই হাহাকার করে, মনটা ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠে, বাবা, মা, এমন কি সংসারের সব কিছুই উপরে।

ক্রমে একটু একটু করে রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলাম। কোন কিছুই গ্রাহ্য করতে মন চায় না—নিজের দুঃখ, কষ্ট, প্রহার, অনাহারকেও নয়। যা হয় তা হবে; যা করে, তা করবে; কুচ, পরোয়া নেই—এই রকম একটা মনোভাব।

তখন বারো পার হয়ে মাত্র তেরোয় 'পা' দিয়েছি। আমারই

যুতাপাথর বাড়ী

বেপরোয়া দুর্বৃত্তপনায় মায়েব অত্যাচার আর বাবাব অবিচার প্রতাহই সীমা ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। বাড়ীতে থাকতে বড় একটা পারি না—থাকতে দেয়ও না। এখানে সেখানে ঘুরি, আর প্রতিবেশীদের গাছের ফল-মূল খেয়ে পেটের জ্বালা মিটাই।

প্রতিবেশীবা জানে সব, তবু জেনেও কিছু জানতে চায় না। তার শুধু আমাকে একটা বয়াটে, লক্ষ্মীছাড়া, ডানপিটে বলেই জানে, আর অপরকেও তাই জানায়। কিন্তু এই হতভাগ্য বয়াটে ছেলেটাব বালা জীবনের গলদটা যে কোথায়, সে-কথাটা কেউ একবার ভেবেও দেখে না। আমার তরুণ জীবনের করুণ ইতিহাসেব মসীলিঙ্গ পাতাগুলি তাদের চোখের স্মৃথেই খোলা পড়ে আছে। তবু কেউ একবার দয়া করে সেগুলো উল্টেও দেখে না।

আমাদের জ্ঞাতিবা সবাই কাছাকাছি বাস করতেন। তবু আমাদের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশ এক বকম উঠেই গিয়েছিল। আমাদের ভাল-মন্দ, কোন কথাতাই তাঁরা থাকতেন না। কিন্তু কি জানি কেন, আমাব বয়াটেপনায় তাঁদেরও মান-সন্ত্রম নিয়ে বাস করা দায় হয়ে পড়লো।

এত বড় বনেদী বংশেব ছেলে এমন দুর্দান্ত হয়ে উঠলে ইচ্ছন্ত থাকে কি করে? কাজেই তাঁরা সকলে মিলে বাবাকে উত্ত্যক্ত করে তুলতে লাগলেন আমাকে রীতিমত শাসন আর সংশোধন করগাব জন্তে। তাঁরা স্পষ্ট বলে দিলেন যে, ছেলেকে আদর আর আস্কারা দিয়ে পরের ক্ষতি করগাব সঙ্গিকাব তাঁর নেই। কাজেই তিনি এব প্রতিকার করতে বাধ্য।

মৃত্যুপথের যাত্রী

বাবা একেই তো সর্বক্ষণ তাঁর কর্মক্লাস্ত দেহে একটা তপ্ত মেজাজ নিয়ে থাকতেন ; তার উপরে আমার জন্তে পরের কাছে তাঁর অপমান ! তিনি রেগে আশুন হ'য়ে উঠলেন । খুঁজে পেতে, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই তো চোরের মার মেরে আধমরা কবে ছাড়লেন । তাবপর হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে আমাকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখলেন বন্দী কবে । আমার মা'ও বাবার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে “মব, যমেব বাড়ী যা” ইত্যাদি অসংখ্য মধুর বুল্লির দ্বারা সম্ভাষণ শুরু কবে দিলেন । প্রহারের ব্যথায় আমার চৈতন্য অনেকটা অসাড় হ'য়ে এসেছিল, তাই মায়ের সব গালাগালি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি ।

সেদিন আর কিছু খাইনি । খেতে দিয়েছিলই বা কে ? পরের দিন একথোলা পান্তাভাত আর একটু ছুন মা আমার ঘরে দিয়ে গেলেন । হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বল্লেন—“নেও, গেলো । এত দিন খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলুম, তার কাজ খুব দেখাচ্ছ । এমন করে আমাদের মুখ পুড়িয়ে না বেড়িয়ে ঘরেই মরে পড়ে থাকতে পারো না ? তা হ'লেও বুঝতাম যে একটা পাপ বিদায় হ'লো । এখন গেলো । গিলে, আমার মাথাটা কিনে বাখো ।”

খালাটা ধপাস্ করে আমার স্তমুখে বসিয়ে দিয়ে গজ্ গজ্ করতে করতে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন । আমারও মনটা এত বিষয়ে উঠলো যে, সে-কথা আর বলবার নয় ।

দোষ না হয় করেছি—যদিও সেটা আমার দোষ বলে মানতে পারি না । তা হ'লেও সে-দোসের সাজা তো বড় কম হয়নি ? বাবা হ'য়ে ছেলেকে এত মার কেউ মরতে পারে, তা আমার জানা

মৃত্যুপথের যাত্রী-



আন হলে দেখলাম. আমার মাথার কাছে এক দৌকপিনী বিধবা আছেন

মৃত্যুপথের বাড়ী

ছিল না। কিন্তু বাবা তো একটু পরেই বেরিয়ে চলে গেলেন। মা কি তার পরেও আমায় একবার খুলে দিতে পারতেন না! সতীনের ছেলে বলে কি আমি তাঁর শত্রু হয়ে জন্মেছিলুম? কই, আমি তো একদিনও তেমন ভাবিনি! দিনের মাঝে একটিবারও যদি তিনি আমার সঙ্গে একটু হেসে কথা কইতেন, তবেই আমি যে কত খুসী হ'তুম!—কিন্তু তা হলো না একটি দিনও।

যা হোক, অবশেষে নিজের ব্যবস্থা নিজেই আরম্ভ করলুম। ভাতের খালার দিকে ফিরেও না চেয়ে কোনমতে পায়ের বাঁধনটা খুলে ফেললাম। তখনো কিন্তু মাথা ঘুরছে, গা! টলমল করছে। কোন কিছু গ্রাহ্য না কবে, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালাম। তাৎপর্য “যা থাকে কপালে” ভেবে, বাড়ী ছেড়ে আবার দিলাম দৌড়।

সেই থেকে বাড়ী আর ঢুকিনি—কারণ, সেইদিনই প্রথম জানলাম যে, ও-বাড়ী আমার নয়, ও-বাড়ীর কারও সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্বন্ধ কিছু নেই। মা বলে এতদিন যাকে ভেবে এসেছি, তিনি আমার মা নয়—সংমা। আর বাবা যিনি, তিনিও বিমাতার গণ্ডিতে পড়ে আমার পক্ষে ক্রমেই যেন দুঃসহ হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই ঠিক বুঝে নিলুম, ওঁদের দু'জনের কাছ হতে ছেলের দাবী, ছেলের অধিকার কোনদিনই পাইনি, পাবও না। ওঁদের কাছ থেকে আমার একমাত্র পাওনা হচ্ছে নির্ধর্ম শাসন বা অত্যাচার—সেও ভিত্তিহীন অপরাধের ওজুহাতে! বুঝলুম, মেহের দাবী যাদের কাছে নেই, তাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে গেলে, প্রতিপালনের দায়টা তারা এমনি করেই আদায় করে থাকে। সুতরাং ওঁদের সম্পর্ক না রাখাই শ্রেয়।

যুগ্মপথের যাত্রী

কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিলে গয়লা-পাড়ার একটি বুড়ী। একটি মাত্র গাইগরু সম্বল করে সে একখানা মাটির ঘরে বাস করে। খানও ভানে, কাটনাও কাটে। তাইতেই একরকম স্বচ্ছন্দে তার চলে যায়। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক বকম টলতে টলতেই চললাম যেদিকে ছুঁচোখ যায়। চারপাশে জ্ঞাতিদের বাড়ী। ভয় হলো যদি তারা বাবার পক্ষ হয়ে আমাকে আবাব ধরে ফেলে! তাই এর আনাচ, ওর কানাচ দিয়ে বাগান-পুকুরের ধার ধঁরে লুকিয়ে চলতে লাগলাম।

গ্রামের এক কিনারায় গয়লা-পাড়া। তার পরেই মাঠ। ভাবলুম, গয়লা-পাড়ার ভিতর দিয়ে সোজা মাঠে গিয়ে পড়বো। তারপর মাঠ ভেঙে যাবো এমন কোন দেশে, যেখানে বাবা, মা, কি আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার সন্ধান করতে না পারে।

কিন্তু সঙ্কল্প দৃঢ় হ'লেও, দেহ সেই অমুযায়ী সবল ছিল না। আগের দিন থেকে পেটে কিছুই পড়েনি। তার উপরে মারধোর, অত্যাচার সহিতে হয়েছে চূড়ান্ত রকম। কাজেই আমার শরীর যেন আর বহিতে চাইলে না। একদিকে ক্ষিপ্তে যতটা কাতর না হই, জল-তেষ্টায় বুকের ভিতরটা যেন তার চেয়েও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগলো। শেষে গয়লা-পাড়ার শেষের দিকে একটা জঙ্গল-ঘেরা পুকুর দেখে তার ভিতবে নেমে পড়লাম জল খেতে।

আঁজলা করে জল খেয়ে ক্ষিদে-তেষ্টা কমলো বটে, কিন্তু শরীর যেন আরও এলিয়ে পড়লো। শেষে সেই পুকুরটার ধারে একটা আমগাছের ছায়ায় বসে পড়লাম একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে।

হৃত্যপণের বাতী

বসে বসে অবশেষে জুয়ে পড়লাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা বলতে পারি না।

সন্ধ্যার ঠিক আগে কাব যেন ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, আমার পরিচিত গয়লানী ইচ্ছের মা আমার গা ঠেলেছে আর বলছে—

“ও বাবাঠাকুর! একি! এই জঙ্গলের ধারে, মাটিতে পড়ে ঘুমোচ্ছো? এখানে যে ভারী সাপ। ওঠা ওঠা। ভদ্র নোকের ছেলের এ কি দুর্ভাগ্য বাপু!”

এক রকম হাত ধরেই সে আমাকে বসালে। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার সর্বাবঙ্গের মারের দাগগুলো লক্ষ্য করে রীতিমত সমবেদনা-মাথা স্বরে বলল :

“আহা! তোমাকে বুঝি খুব করে মেরে বাডী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! তাই বলি—নইলে ভদ্র লোকের ছেলে এখানে এসেই বা ঘুমুবে কেন? আহা! যার মা নেই, জগতে তার কেউ নেই। নইলে ছুধের ছেলে—তাকে এগ্নি করে মারে গো?”

দেখলাম, বুড়ীর মুখটা কঁাদো কঁাদো হয়ে তার চোখ থেকে ছ’ ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোথাকার কে গয়লানী—আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই, আমার সত্যিকারের মারও সে দেখেনি, গায়ের দাগ থেকে অনুমান করেই আমার কষ্টে সে বাথিত হয়ে উঠেছে। এ কি অসম্ভব ব্যাপার!

কই, আমার বাবা বা মা তো কোনদিনই আমার জন্মে বাধা বোধ করেননি! মার খেয়ে হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছে, ছ’-একবার

হৃদয়গর্ভের স্নান

রক্তও বেরিয়েছে দাঁত মুখ থেকে। তবু সমবেদনার “আহা” তো ধূরের কথা, তার উপরে অনাহারের ব্যবস্থা দিতেও তাঁরা ইতস্ততঃ করেননি।

আব আজ একজন সম্পূর্ণ অনাখ্যায় সে, আমার দুঃখ বল্লন করে সহানুভূতিতে গলে গেল। তার চোখ দিয়ে বেরুলো কান্নার জল। এ কি অসম্ভব ব্যাপার? এমন অদ্ভুত আচরণ আমার জ্ঞানে তো কাউকে কবতে দেখিনি।

‘আমি যেন কেমন হ’য়ে গেলাম! মস্তমুকের মত আমি তার দশীভূত হয়ে পড়লাম।

সে আমার হাত ধরে আদর করে টানতে টানতে আবার বলে—“এসো বাবাঠাকুর! আমার কুঁড়েতে এসো। আহা! বাবা নদীঘাট দাগড়া-দাগড়া হয়ে উঠেছে। এমন কেউ নেই যে, একটু তেল লাগিয়ে দেয়? এসো বাবা! আমি তোমার গায়ের ব্যথা কমিয়ে দেব। আহা! বোধ হয় তারা খেতেও দেয়নি তোমাকে? নইলে মুখখানা এমন শুকিয়ে যায়?”

‘আমি কিছুমাত্র দ্বিধাক্তি না করে একান্ত বশীভূতের মত তার পিছনে পিছনে চলে তার মাটির ঘরটিতে এসে উঠলাম।

বুড়ী আমার কত সেবাই করলে। আমার সারা গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে দিতে অস্তিত্ব একশো বার “আহা, উহু” করে তার সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগলো। শেষে আমাকে তার বিছানায় শুইয়ে রেখে সে গাই হ’য়ে একবাটি দুধ গরম করে আনলে। বুড়ীর গীড়াগীড়িতে প’ড়ে একরাশ মূড়ি, কলা আর সেই দুধ দিয়ে পেট ভরে আমি ফলার করলাম।

বুদ্ধশব্দের যাত্রা

তখন রাত হয়ে গেছে। বুড়ী আমাকে কোথাও যেতে দিলে না। আমারও বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো তার কথা ঠেলতে। যে কখনো স্নেহ-যত্নের মুখ দেখতে পায়নি, সেই আমি তার সেই অযাচিত অথচ অকৃত্রিম মায়া-মমতাব আশ্বাদ লাভ করে, আমার জীবনে এই প্রথম যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেলাম! হ'লোই না সে গয়লানী, তবু মনে হ'তে লাগলো, সে বুঝি আমার জন্মজন্মান্তরের অতি আপনার লোক।

রাতে বুড়ী আমাকে তার বিছানাটি ছেড়ে দিয়ে, তারই পাশে একটা চাটাই পেতে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে কত কথাই সে বলতে লাগলো! আমার মায়ের অসামান্য রূপ আর তাঁর গুণের কথা, বুড়ীর প্রতি তাঁর কত বারের কত রকম সদ্‌ব্যবহার! রীতিমত সম্রাট বংশের মেয়ে হয়েও দীন-হুঃখী, ইতর জাতের লোকদের উপর তাঁর অসীম দয়া, মায়া, মমতার বস্তান্ত, তাঁর দেব-দ্বিজ আর অতিথির প্রতি ভক্তি প্রভৃতি নানা গত কথা বলতে বলতে তার গলার স্বর ক্রমেই ভারী হয়ে আসতে লাগলো। সেই অন্ধকারেই বুঝতে পারলাম যে, বুড়ী মাঝে মাঝে সত্যি সত্যিই কাঁদছে।

আমার বুক চিরদিনই শক্ত আর মনটাও হয়ে উঠেছিল রীতিমত কঠিন; তবু সেই সব অজানা পুরোণো কথা শুনতে শুনতে কি এক অজানা ব্যথায় আমার বুক যেন টন্ টন্ করে উঠতে লাগলো। আমার মন যেন কোন্ এক অজানা রাজ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলো এক চির-অজানা অচেনা দেবীমূর্তিকে, যার স্বরূপ কখনো চক্ষু দেখেছি ব'লে মনে হয় না। কিংবা যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এতদিন বল্পনাতেও আনতে পারিনি—আজ এই বুড়ীর মুখে তাঁর দেবীত্বের

যুঁড়াপথের বাড়ী

মহিমা বর্ণনা শুনে আমার চির-বুভুক্ষিত প্রাণ যেন কেবলই হাহাকার কবে উঠছিল তাঁকে হারাবার বেদনায়।

মাথার বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে আমি বুড়ীর কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম।

ছয়

অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের কথা চললো। বুড়ীকে আপনার লোক ভেবেই অকপটে তার কাছে আমার ব্যথার কথা সব বললাম। বুড়ী কত ‘আহা’, ‘উহু’ করলে, কতবার কাঁদলে। শেষে বললে :

“চলে এসে বেশ করেছ বাবাঠাকুর! তুমি আর ওঁদের কাছে যেও না। ডাক্তারী সংমা এবার হাতে পেলে নিশ্চয় তোমাকে মেরে ফেলবে। তার চেয়ে যেখানেই যাও, দুটো ভাত কি আর তোমার মিলবে না? বলে, ‘জীব দিয়েছেন যিনি, ‘আহার দেবেন তিনি।’ তবু তো যখন তখন মারের হাত থেকে বাঁচবে! আহা! কচি ছেলে...”

ঘুমোতে রাত প্রায় একটা বাজলো। তারপর সকাল হতেই দেখলাম অর হয়েছে। ভয়ানক জ্বর। আর কি অসহ্য যন্ত্রণা। সারা শরীরে যেন বিষকোঁড়া উঠেছে। যন্ত্রণার ঘোরে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করলাম।

মৃত্যুপথের যাত্রা

বুড়ী ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু তবু সে বুদ্ধি হারায়নি, তাই রক্ষে । আমার কথা সে পাড়ার কাউকেই জানতে দিলে না—পাছে আমার বাবা ও মা খবর পেয়ে আমাকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যান । এই কঠিন অসুখের উপর তাঁরা আরও অত্যাচার করলে আমি কি আর বাঁচবো ?

বুড়ী আমার সেবা করতে লাগলো । সে কি সেবা ! আর কি মিষ্টি সান্ত্বনার কথা ! আমার মনে হ'লো, এতদিন পরে বুদ্ধি আমার স্বর্গগতা মা বুড়ীর রূপ ধরে তাঁর ছেলের হুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে এসেছেন ! কৃতজ্ঞতায় আমার হুঁচোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল । ওষুধ-পত্র বিশেষ কিছু না পেলেও তার সেবাতেই সেরে উঠলাম এক সপ্তাহের মধ্যে ।

কিন্তু দুর্বল হয়ে গেলাম খুবই । তাই আরো কিছুদিন বুড়ীর ঘরেই গোপনে বাস করতে 'লো । শেষে একদিন বুড়ীই বললে :

“বাবাঠাকুর ! আমার একটা কথা শুনবে ? আমি কিন্তু তোমাকে না জানিয়েই তোমার একটা ব্যবস্থা করেছি । বামুন-পাড়ার রামতারণ বাবু—তোমাদেরই তো তিনি দশরাতের জ্ঞাতি । বামুন বড় ভাল লোক । তাঁদের বাড়ী আমার যাওয়া-আসা আছে কিনা—তাই কথায় কথায় তোমার কথা আমি তাঁকে সব বলেছি । তাই শুনে তিনি কত হুঃখ করতে লাগলেন । বললেন—“আহা ! ছেলেটার কি দুর্ভাগ্য ! নইলে এমন বেরাত নিয়ে জন্মায় ? জ্ঞাতি হ'লেও, ওর বাপ আমাদের ‘পরম শত্রু’ । তাই তো ওদের কোন কথায় আমরা থাকি না । নইলে আমাদের বংশে জন্মে, ছেলেটা কি এমন সংমায়ের দায়ে ভেসে যেতে পারতো ?”

আমিও তোমার হ'য়ে অনেক কথা তাঁকে বুঝিয়েছি। তখন তিনি আর তাঁর পরিবারে, দু'জনে পরামর্শ ক'রে, আমাকে কি বল্লেন, জানো? বল্লেন, “ইচ্ছের মা! তুই ছেলেটাকে আমাদের কাছে নিয়ে আয়। আমরা তাকে দেখবো শুনবো, প্রতিপালন ক'রবো। আহা! হাজার হোক আমাদের বংশের ছেলেই তো? তবে সে কিন্তু বিছুতেই তার বাপের কাছে যেতে পাবে না। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখাও আর চলবে না। শুধু এই সর্বোত্তম আমবা তার সমস্ত ভার নিতে প্রস্তুত আছি।”

তা বাছা, এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। হলোই বা তারা পর—তবু জ্ঞানিত তো? আর তাদের অবস্থাও ভাল। ডাইনী সংমায়েব গলগ্রহ হওয়ায় চেয়ে তাদের কাছে থাকা কি মন্দ? অবিশিষ্ট তোমার বাবা হাঙ্গামা বাধাতে পারেন—আর বাধাবেনও নিশ্চয়। কিন্তু তুমি না গেলে তোমাকে নিয়ে যায় কে? তাঁর স্পষ্টই বলেছেন যে, তোমার বাপের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করতে হয়, তাঁরাই করবেন! তুমি যদি স্বেচ্ছায় না যাও, তাঁর সাধাও হবে না তোমাকে নিয়ে যেতে।

তাই বলছিলাম কি বাবাঠাকুর, তুমি ওইখানেই চলো। দুধেব ছেলে, যাবেই বা আর কোথায়? শেষে কি না খেতে পেয়ে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে? অনেক ভেবে-চিন্তে তবে আমি এতে রাজী হয়েছি। যাবে তুমি? বলতো আজই তোমাকে সেখানে রেখে আসি।”

বুড়ীর কথায় প্রথমটায় রাজী হইনি। আবার সেই গাঁয়েই থাকা? বাপ-মায়ের চোখের উপরে? একটা সঙ্কোচের ভাবও

মৃত্যুপথের যাত্রী

এসে পড়লো। ভাবলুম—কাজটা কি ভাল হবে। হাজার হোক, বাপতো! একটু কড়া-মেজাজের লোক হ'লেও তিনি দয়ামায়াহীন পশু নন, সে-কথা আমি জোর ক'রেই বলতে পারি।

কিন্তু নিজের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পবে বিমাতার অভিযোগ-গুলি তাঁকে এমন উগ্র ও বিবাক্ত করে তোলে যে, তখন আর তাঁর ত্রায়-অত্রায় বিচারের শক্তি থাকে না। সেজন্ত যতটুকু মাথা খাটানোর দরকার, তেমন পরিশ্রম কবাব তাঁর শক্তি বা অবসরই বা কাঙ্জেই তার বিষময় ফল ভোগ করতে হয় আমাকেই।

এমন অবস্থায় এই গ্রামেই যদি থাকি, তবে বাবার কাছে ন থেকে অত্বেব কাছে থা! . . . —সেটা কতটা সম্ভব হ'বে?

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, আমার আবার 'সঙ্গত' 'অসঙ্গত' কি আছে? বাবার কাছে যাওয়ার মানেই হচ্ছে আবার সেই সংসার খপ্পরে পড়া। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আধিপত্য ও অভিযোগে বাবার হাতে আমার লাঞ্ছনার আবার এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবে।

কাঙ্জেই স্থির করলুম—না, সে হ'তেই পাবে না, বাড়ীতে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

মুহূর্তের উত্তেজনায় তেঁতো মন নিয়ে রাগ ক'রে বেরিয়েছিলুম যখন, তখন অগ্রপশ্চাৎ ভাবিনি। এখনও আর ভাববার অবসর নেই।

বাড়ী থেকে বেরিয়েই কি বিপদ আমার কেটে গিয়েছিল? ভাগ্যক্রমে এমন মায়ের মত বুড়ীকে পেয়েছিলাম তাই,—নইলে হয়তো বেঘোরে মারা পড়তুম।

মৃত্যুপঙ্খের যাত্রী

এই হিতাকাঙ্ক্ষিণী বুড়ী শুধু যে আশ্রয় দিয়ে, সেবা-যত্ন করে আমায় বাঁচিয়েছে, তা নয়—সে আবার আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত চিন্তাই করেছে! ভয়ের কারণ কিছু থাকলে, সে কখনো আমাকে পরের বাড়ী থাকতে বলতো না। নিশ্চয়ই সে তাদের সম্বন্ধে ভালরকমই জানে। নইলে কি সে আমাকে না জানিয়েই আমার জন্তে এ ব্যবস্থা করেছে?

শেষে বুড়ীর ব্যবস্থাই মেনে নিতে হ'লো।

সেই দিন রাতে বুড়ীর সঙ্গে জ্ঞাতির বাড়ী গিয়ে উঠলাম। তাঁরাও বেশ খুশিমনে, সমাদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন। বুড়ী মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখে যাবে বলে আশ্বাস দিয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু আমার সঙ্গে তাকে আর দেখা করতে হ'লো না। চির-হতভাগ্যকে স্নেহ করবার অপরাধে কলির ভগবান্ বুদ্ধি তাকে চরম-দণ্ড না দিয়ে আর থাকতে পারলেন না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিস্মৃতিকা রোগে আমার মাতৃতুল্যা হতভাগিনী তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্ত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এই নিদারুণ সংবাদ শোনা অবধি বুড়ীর জন্তে আমার মনটা হাহাকার করতে লাগলো। জীবনে প্রথম স্নেহের সন্ধান ওই বুড়ীর কাছেই পেয়েছিলাম, সে-কথা আমি আজ কিছুতেই ভুলতে পারলুম না। নিজের মাও বুদ্ধি তার সন্তানের জন্ত এতটা করে না। বুড়ীর শোকটা তাই মাতৃশোকের মত আমার বুকের উপরে চেপে বসলো।

সাত

দিন কাটতে লাগলো। নতুন আশ্রয়ে এসে প্রথম দু'চার দিন যত্ন পেলাম বেশ, কিন্তু তারপর থেকে ক্রমেই তা কমতে লাগলো। ঘরের ছেলে আর পরের ছেলের যত্নের মধ্যে পার্থক্য কতখানি হওয়া উচিত, তা বুঝতে মোটেই দেরী হলো না। তবু দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তো পাচ্ছি, কাজেই তার জগে ক্ষোভ করবার আর আছে কি ?

ক্রমে দু'একটা করে ছোট ছোট কাজের ভার আমার ঘাড়ে চাপতে লাগলো—অবশ্য তা মিস্ত্রি কথার উপর দিয়েই। আমিও বিনা আপত্তিতে, খুশিমনে তা করে যেতে লাগলাম।

তামাক সাজা, দোকান-বাজার কবা, ছোট ছেলে-মেয়েদের সামলানো থেকে, শুরু হয়ে ক্রমে চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই জলতোলা, বাসন-মাজা পর্য্যন্ত ঘাড়ে এসে পড়লো। চাকর, দাসীর অভাব, কত্রীর অসুস্থতা ইত্যাদির অজুহাত—থাকতে গেলে এমন একটু-আধটু সাহায্য করতেই হয়। ঘরের কাজ,—এতো আর পরের কাজ করা নয় ? কাজেই আপত্তি করবার মুখ আর থাকে কই ?

আমার জ্ঞাতি প্রতিবেশীদের চোখ কিন্তু বেজায় টাটিয়ে উঠলো। তাঁরা আড়ালে-আব্‌ডালে আমাদের অনেক রকম বোঝাতে শুরু করলেন। কেউ কেউ নিন্দা, ভৎসনা করতেও কন্‌শুর করলেন না।

বহুপথের রাজী

ভালোকেদের ছেলে হয়ে, এই বয়সে বাপ-মার সম্পর্ক কাটিলে পরের বাড়ী বিনা পয়সায় চাকরবৃত্তি ক'বা আতি জঘন্য কাজ, এতে বাপের মাথা হেট করা হয়, বংশের নাম ডুবে যায়। বাপ বেঁচে থাকতে বাপের জ্ঞাতিব চাকর হ'য়ে থাকা! ছিঃ! ছিঃ! আমি যেন আর একটি দিনও এখানে না থাকি। বাপের কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাঁর কাছে গিয়েই যেন উঠি।

কেউ বললে—“ধিক্! ধিক্! তুমি বাপু এমন কুলান্নাবণ্ড হয়েছ? তোমার ভিতর কি একটু মনুষ্যত্বও নেই? বাপ না থাকতে তার শত্রুর বাড়ীতে বাসন মেজে, জল তুলে বেড়াও? গলায় দড়ি দিতে পাব না? এমন বয়াটে, বদমায়েস, লঙ্কীছাড়া হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তোমাব পক্ষে মরণই ভাল।”

সকলের কথাই শুনে যাই, কিন্তু উত্তর করি না। বুঝি যে, তাঁদের অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা নয়। তারা যা বলেন, তা ঠিকই। কিন্তু তাঁরা আমার প্রাতি সমবেদনার খাতিবে কিছুই বলেন না। তাঁরা বলেন হিংসায়। তাঁরা থাকতে রামতারণবাবুই যে এমন একটা বিনা মাইনের চাকর পেয়ে যাবেন, সেটা তাঁদের অসহ্য। নইলে, যে হতভাগাকে তার শৈশব থেকেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে দেখেও তাঁদের একটি দিনের জন্তেও বিন্দুমাত্র সমবেদনা জাগেনি, আজ হঠাৎ তার উপরেই বা এত দরদ কেন?

নিজের হীন দশা বুঝেও তাই চূপ করেই থাকি। ভাবি, রামতারণবাবুরই বা দোষ কি? দোষ আমার ভাগ্যের। এরা যে ছবেলা ছমুঠো খেতে দিচ্ছে, এই যথেষ্ট। এতে মান-অপমান

বহুপথের রাজী

ভেবেই বা করবো কি ? মারধোর ও লাঞ্ছনার হাত থেকে যে রেহাই পেয়েছি, এট যথেষ্ট ।

এমনিভাবে আরো তিন মাস কাটলো । তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম এক অপূর্ব কথা ! রামতারণাবু আর তাঁর স্ত্রী গোপনে তা আমাকে শুনালেন । আমিও খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম ।

শুনলাম, আমার গর্ভধারিণী ছিলেন এক অবস্থাপন্ন লোকের একমাত্র মেয়ে । তাঁদের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন আমার মা । কিন্তু তাঁর ছিল জীবন-স্বত্ব অর্থাৎ যতদিন নিজে বেঁচে থাকবেন, ভোগ করতে পারবেন, বেচবার কোনো অধিকার নেই । কিন্তু তাঁর যদি কোন সন্তান হয়, তবে সে-ই হবে তার মাতামহের সমস্ত সম্পত্তির আসল মালিক ।

মা কিন্তু সে সম্পত্তি ভোগ করতে পারেননি । কারণ, তার অল্পদিন পরেই আমার জন্ম হয়, আর তিনি আঁতুড় ঘরেই দেহত্যাগ করেন । সে-ই দিন থেকে আমিই আমার দাদামশায়ের সব সম্পত্তির মালিক হয়ে আছি ।

এতবড় একটা সম্পত্তির মালিক আমি—এই হিংসায় আমার সংসার মনটা আরও বেগী বিবিয়ে উঠেছিল । কিন্তু আমি সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্পত্তি তো আমার দ্বারা তাঁর নিজ নামে লিখিয়ে নিতে পারেন না ! অথচ আমি সাবালক হ'তে তখনও ঢের দেরী, কাজেই তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় পেরিয়ে গিয়েছিল—তারই ফলে বাবার কাছে তিনি আমার নামে অত বেশী অভিযোগ করতেন ।

যত্নপথের বাড়ী

রামতারণবাবু বল্লেন,—কোনো রকমে আমি সাবালক হ'লেই আমার সংমা আমাকে দিয়ে ওই সব সম্পত্তি তাঁর নিজের নামে লিখিয়ে নিতেন—তারপর দিতেন আমাকে দূর করে। এই মতলবেই হেলায়, অশ্রদ্ধায় আমাকে মানুষ করা হ'চ্ছিল।

রামতারণবাবু সবই জানেন। বরাবরই তিনি নাকি হুঃখু করে এসেছেন আমার জন্যে। কিন্তু কি করবেন ? তাঁর কোন হাত ছিল না। তারপর ইচ্ছের মার মুখে আমার দুর্দশার কথা শুনেই তিনি স্থির করেছিলেন, আমি যদি রাজী হই, তাহলে তাঁর যথাসাধা আমাকে সাহায্য করবেন। বাপ-মার কবল থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনতে পারলেই, আমার বিমাতার মন্দ অভিপ্রায়ে বাধা দিতে পারবেন।

আমাকে তাঁদের ঘরে স্থান দেওয়ার কারণই তাই। তারপর নিজের অর্থ ব্যয় কবে আমার বাবাকে ফৌজদারীর হাত থেকে যে বাঁচিয়েছেন, তাও সেই উদ্দেশ্যে। নইলে কি সহজে তিনি আমার অভিভাবকের দাবী ছেড়ে দিয়ে রামতারণবাবুকেই আমার অভিভাবক বলে স্বীকার করতেন ?

রামতারণবাবু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে বল্লেন, “তা যাক্, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করেছেন। সেই বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেওয়ার উপায় এখন আর তাঁদের নেই। কিন্তু সম্পত্তি তাঁরা আর এক কু-মতলবে মেতেছেন। জমিদারকে দিয়ে নীলাম করিয়ে তাঁরা বিষয়টি কিনে নিতে চান। তুমি তা জানবেও না—জানলেও কিছু করতে পারবে না। কারণ, তুমি আজও সাবালক ; তায় আবার কপর্দকহীন।”

মৃত্যুপথের যাত্রী

রামতারণবাবু এই পর্য্যন্ত বলে একটু নীরব হলেন, তারপর ছ'একবার ঢোক গিলে ও একটু কেসে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তাঁর কাছে আশ্রয় পাবার জন্য আমার কতটা কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আমি তা স্বীকার করলাম।

আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে রামতারণবাবুর বুকে বুঝি কিছু বল হল, তিনি তখন সাহস করে বললেন, “সে তুমি চিরদিনই স্বীকার করবে, আমি তা জানি। কারণ, লোকে যে যাই বলুক, তুমি অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম নও, সেকথা আমি বেশ জোর গলায় বলতে পারি।

এখন কথাটা কি হচ্ছে জান? জমিদারের মারফৎ যদি বিষয়টা ঐ ভাবে নীলাম হয়ে যায়, তবে তুমি চিবদিনের জন্য ফকির হয়ে যাবে। কাজেই আমি এক মতলব ঠিক করেছি, শোনো। তুমি নাবালক হলেও, অবোধ নও। তুমি নিশ্চয় আমার উপদেশ অবহেলা করে নিজের পায়েই কুড়ুলের ঘা দেবে না। আমার পরামর্শ যদি শোনো, তবে তোমার বিষয় নেয় কে ৭ ছদ্দিন বাদে তোমার এমন পরের গলগ্রহ-দশা ঘুচে যাবে। তখন তুমি হবে একটা রীতিমত অবস্থাপন্ন লোক আর তুমিই তখন কৃতজ্ঞকে সাহায্য করতে পারবে।

তোমার এখন উচিত হচ্ছে কি জান? তোমার এই সম্পত্তি অগ্নি কারো নামে বেনামী করা।

সম্প্রতি আমিই তোমার অভিভাবক—দেশশুদ্ধ লোক সেই সাক্ষ্য দেবে। কাজেই তুমি যে বেনামী বিক্রি-দলিল করবে,

যজ্ঞপথের রাজী

অভিভাবক হ'য়ে আম- তা'তে সই দিতে রাজী আছি। তাহলে তোমার সংমার পরামর্শেও তোমার বাবা আর কিছুমাত্র নড়্, চড়্ করতে পারবেন না।

আইনে যদি কিছু আটকায় সে আমি দেখে নেবো। এমন একটা দলিল পণ্ড করতে হ'লে যে বুদ্ধি ও অর্থের দরকার, তোমার বাবার সে সব কিছুই নেই। কাজেই তোমার দলিল সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত থেকো। আমি যা'তে আছি, তা নড়্, চড়্ কবা তোমার বাবা বা তোমার সংমার কাজ নয়।”

একটু দম নিয়ে রামতারণবাবু আবাব বলতে লাগলেন, “দেখো, আমাব এক শ্যালক আছে; তার নাম রজনীকান্ত।

বজনী খুব ভাল ছেলে। এই বাড়ীতেই সে মানুষ হয়েছে। আমার আর আমার স্ত্রীর কথায় সে ওঠে বসে। সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। অতএব বিক্রয় কবালাটা তুমি তারই নামে করে দাও। বিষয়টা নিরাপদ হবে।

মনে রেখো, কাজটা কিন্তু খুবই জরুরী। এতে দেরী করা মোটেই চলে না। তোমার সংমার পরামর্শে তোমার বাবাও নিজে যে রকম চেষ্টা জুড়েছেন, তা'তে নীলাম হয়তো এই মাসেই হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাকে রেজেষ্ট্রী করে দিতে হবে ছ একদিনের মধ্যেই।”

যজ্ঞপথ ধরে সব কথা শুনে গেলাম। কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না। সে জগ্রে ভাবনাও হ'লো না এতটুকু। বিষয়

মৃত্যুপথের যাত্রী—



শেষে চোরাই মাল বেরুলো আমারই বিছানার তলা থেকে ।

মৃত্যুপথের যাত্রী

সাভের কথা কিছুই জানতাম না, সে আশাও কখনো করিনি।
তেরো বছরের ছেলে—বিষয়ের বুঝি বা কি ?

এইটুকু শুধু বুঝলাম, রামতারণবাবু এখন আমার বাবা ও
মায়ের দোষ দেখিয়ে সম্পত্তিটা বেনামী করে নিতে চান।

তার উপর একটু ঘণা হ'ল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল,
জমিদারের চক্রান্তে সম্পত্তি যদি নীলামই হ'য়ে যায়, তবে তো
কারোই কোনো ভোগে লাগবে না। সংমা যদি কৌশল করে
কিনিয়ে নিতে পারেন, তা হ'লেও কারো কোনো কাজে আসবে না
—আমার বাবারও নয়। কারণ, সংমা তখন অহঙ্কারে বাবাকেও
তুচ্ছ করবেন, তার উপর নানা অত্যাচার করবেন।

তার চেয়ে রামতারণবাবুর পরামর্শ মত যদি দলিলটা করে দিই,
তা হ'লে সম্পত্তিটা কালে হয়তো রামতারণবাবুর ছোট ছেলে
'চাঁদুর' হাতেও কিছু এসে যাবে।

যে সম্পত্তির আমি কিছুমাত্র আশা করিনি, তা দিয়ে যদি
'চাঁদুর' কোনো উপকার হয়, তা হ'লে ক্ষতি কি ? বেনামী সম্পত্তি
আমাকে যদি ফিরিয়ে দেয়, আমিও তা হ'লে চাঁদুকেই কতকটা
দিব,—তাকে যে আমি বড্ড ভালবাসি! আর আমাকে যদি
ফিরিয়ে না দেয়, তা হ'লেও চাঁদুর হাতে যাবার সম্ভাবনাই
সবচেয়ে বেশী। চাঁদু পেলে আমার তো ছুঃখের কারণ কিছুই
নেই। কাজেই, আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলাম।

আমার এই সুবুদ্ধি দেখে তাঁরা আমাকে ধন্য ধন্য করতে
লাগলেন। আমার মত বুদ্ধিমান আর আমার মত সংছেলে তাঁরা
যে ইতিপূর্বে দেখেননি, সে কথা তাঁরা বারংবার আমাকে জানিয়ে

হুতুপথের বাড়ী

দিলেন। বহুকাল পরে সেই দিন থেকে আবার সেই প্রথম কয়দিনের মত আদর-যত্ন পেতে লাগলাম।

কিন্তু কে জানত যে সেই আদর যত্ন আমার ভাগ্যে অচিরে আবার আবুহোসেনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে! বিক্রয়-কবালা রেজেন্সী হয় যাবার পরদিন থেকেই হু-হু করে আদব কমতে কমতে সেই বিনা মাইনের চাকরে এসে দাঁড়ালাম এক সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর প্রায় প্রতিদিনই আমার একটা ক্রটি বেরুতে লাগলো। সামান্য অহুযোগ থেকে ক্রমেই ভীষণ ভৎসনা আর গালাগালি আমার যেন নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠলো। বুঝলাম যে অশান্তির জ্বালায় বাপ-মার ঘর ছেড়ে অনির্দিষ্টের পানে ছুটে বেরিয়েছিলাম, এখানেও সেই অশান্তি ক্রমেই যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

বিক্রয়-কবালার কথা জানতে কারো বাকী রইলো না। জ্ঞাতিরা সব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁদের যেন আহা-নিদ্ৰা ত্যাগ হওয়ার উপক্রম হয়ে এল। রামতারণবাবুর বিরুদ্ধে তাঁরা দিনরাত জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিলেন। আমার আর বাইরে বেরবার উপায়ই রইলো না।

পথে ঘাটে যেখানে-সেখানে আমার দেখা পেলেই তাঁরা নানা নিন্দ্ৰা, ভৎসনা, গালাগালি এমন কি নানা রকম ভয় দেখানো শুরু করে দিলেন। সম্পত্তির মালিক আমি হলেও, রামতারণবাবুর মতলব মত কাজ করে আমি যেন তাঁদেরই মহা সর্বনাশ করে বসেছি।

রামতারণবাবুর আশ্রয়ে বাস করাও ক্রমে দুর্ঘট হয়ে উঠলো। কাজের ভার যত বাড়ে, ক্রটির অভিযোগও হতে থাকে তত বেশী।

মুড়াপথের বাড়ী

ফলে বাপের বাড়ীর মত তাড়না, ভৎসনা, প্রহার. অনাহার সব কিছুই পুনরাভিনয় হতে লাগলো কথায় কথায়। পাড়া প্রতিবেশী আর জ্ঞাতীদের তাতে যেন স্মৃতি বেড়ে গেল! তাঁরা সব “বেশ হয়েছে! ঠিক সাজাই হচ্ছে। যেমন কাজ তার তেমন ফল। অমন সর্ব্বনেশে ছেলের এই দশা হবে না তো হবে কার? মর ব্যাটা! আমাদের কথা না শোনবার ফলটা ছাখ্।”... ইত্যাদি নানা মধুব কথা যখন তখন আমাকে শোনাতে লাগলেন। চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে আমি একেবারে নির্ব্বাক হয়ে যেতে লাগলাম।

তারপরেই এক মহা বিপদ। রামতারণবাবুর বড় মেয়ে স্বশুর-বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এল বেড়াতে। তার গায়ে ভারী ভারী সব গহনা। পরদিনই তার গলার হার আর কানেক ছলগোড়া চুরি হয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ খোঁজ—মহা ছলুসুল ব্যাপার! পাড়া-প্রতিবেশী আর জ্ঞাতী-গোষ্ঠীরা কানাকানি করতে লাগলো। শেষে সেই চোরাই মাল বেরুলো আমারই বিছানার তলা থেকে!

কত দিবা, শপথ, কান্না! সবই হ'লো অকারণ। বরং তাইতেই আবো প্রমাণ হ'লো যে আমি একটা পাকা চোর। তখন শুরু হ'লো প্রহার।

আমাকে পুলিশের হাতে দেবার জন্তে সবাই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু রামতারণবাবুর নাকি বড্ড মায়া পড়েছিল আমার উপরে, তাই জেলের বদলে তিনি আমাকে ঠেলে ফেলে দিলেন অনির্দিষ্টের পথে, মাত্র যা কয়েক বেত আর গলাধাক্কা দিতে দিতে।

বৃত্তাপথের বাজী

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপमानে ও প্রহারের ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের পথ ধরে চলতে লাগলাম—যে দিকে ছু চোখ যায়। হতভাগ্যের জীবন আবার আগেকার মতই দুর্বল হয়ে উঠল।

আট

পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাফ নেই। তবু কিন্তু আমার মিথ্যা অপরাধের কথাটা নিমেষের মধ্যে পাড়াময় ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষ সকলেই আমার উদ্দেশে ধিক্কার দিতে শুরু করেছিল। আমার মত বয়াটে বদমাইস চোর ছেলেকে গ্রামে বাস করতে দেওয়া নিরাপদ নয়, এমন কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করতেও অনেকে পশ্চাৎপদ হ'ল না।

কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের পথ দিয়ে যাবার কালে তাঁরা আমার প্রতি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন, যা কেউ পাগলা কুকুরকে দেখে করে কিনা সন্দেহ। সে ধিক্কার, সে নিন্দা, সে গালাগালি, সৈ দূর-দূর ধ্বনি আজও আমার বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। পাড়ার ছেলেরাও তাঁদের শিক্ষামত “চোর! চোর! সবাই সাবধান হও। চোর যাচ্ছে।”...বলে আমার পিছনে দল বেঁধে চীৎকার শুরু করলে। কেউ বা কাদা ছুঁড়ে মারতে লাগলো, কেউ মাথায় টাটি বসিয়ে দিলে। কি কষ্টে যে সে গ্রাম পার হ'য়ে মাঠে এসে পড়লাম, তা আর বলে বোঝাতে পারি না।

তেজস্কর এইবার চূপ করলে। তার অতীত জীবনের করুণ কাহিনী বলতে বলতে তার মত কঠিন-হৃদয় লোকেরও স্বরটা

মৃত্যুপথের যাত্রী

ক্রমেই ভারী হয়ে আসছিল। বুঝলাম, বাল্যজীবনের সে-ব্যথা আজও সে ভুলতে পারেনি। সে স্মৃতি তাঁর জীবনের এই শেষ মুহূর্তেও তার কাছে কষ্টকর। তাই সে নিজেকে সেই দুর্বলতার বিরুদ্ধে দৃঢ় করে নেবার উদ্দেশ্যে একটু নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আমারও মনের উপরে এতক্ষণ যেন একটা ছায়াচিত্রের একটানা অভিনয় হয়ে যাচ্ছিল। তার দৃশ্যের পর দৃশ্যে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে পরিষ্কৃত হয়ে উঠছিল একটা হতভাগ্য মাতৃহীন বালকের জীবন-নাট্যের করুণ-কাহিনী। তার মঙ্গলদ্রুদ ঘটনাবলীর মধ্যে আমি এমন ভাবে আমাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না যে আমি গল্প শুনছি। যা শুনছি, তা যেন আমি স্বচক্ষেই দেখছি—সে সব ঘটনা ঘটেছে যেন ঠিক আমার চক্ষুচক্ষেরই সম্মুখে।

তেজস্কর থামতেই আমারও যেন চমক ভেঙে গেল। আমি যেন আবার আমাকেই আবিষ্কার করলাম সেই লোহার ডাণ্ডাঘেরা জেলের হাজত-ঘরের মধ্যে। বুঝলাম,—যে চির-হতভাগ্য শিশুব করুণ শৈশব-কাহিনী শুনতে শুনতে এতক্ষণ আমি তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলাম, সে-ই আজ ব'সে রয়েছে ঠিক আমারই সম্মুখে, মহা অপরাধী ফাঁসির আসামীর রূপ ধরে।

মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। এক নিমেষে অনেক চিন্তাই যেন তার ভিতরে জটলা বাধিয়ে তুলে। আমার যেন বোধ হ'তে লাগলো যে আমাদের এই সভ্য জগৎ তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা প্রভৃতির যে দর্প করে, সেটা তাদের মস্ত ভুল। নীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা যাদের গায়ে অপরাধীর ছাপ মেরে আসছে,

আসলে অপরাধী হয়ত তারা নয়—আর অপরাধী হ'লেও, শ্রায় বিচার অনুসারে সে জন্তে তাদের সাজা দেওয়া চলে না। সাজার যোগ্যপাত্র হ'চ্ছে তারাষ্ট, যাদের দোষে, বা যাদের জন্তে এরা আইন-বিগর্হিত অশরাধ করতে বাধ্য হয়।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম,—মানুষ মানুষের প্রাণ আর মানুষের প্রেরণা নিয়েই জন্মায়, পশু হয়ে জন্মায় না ; পশু হ'তেও সে আসেনি। তাকে পশু করে তোলে একমাত্র মানব-সমাজের বিরুদ্ধ আবহাওয়া, যার বিবাক্ত স্পর্শ তাকে মানুষ হতে না দিয়ে, একটা কিস্তিকিমাকার মানুষবেশী পশুতেই পরিণত করে দেয়।

আমি তো 'জেলার'। কত চোর, কত খুনে, কত দস্যু, কত নানা অপরাধের অপরাধীকে নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু তাদের সে সব অপরাধের জন্তে দায়ী কি কেবল তারাই ? চোর চুরি করেছে, তাই তার হয়েছে কয়েদ। কিন্তু কেন সে চুরি করলে ? খুনী অপর একজনের বুকে ছোঁরা বসিয়ে দিলে কি জন্তে ? দস্যু কিসের প্রয়োজনে গৃহস্থের যথাসর্বস্ব লুট করে নিলে ? তাদের এ সব অপরাধের কি কোন হেতু নেই ? অপরাধ যে করে সেই দোষী ? আর যে বা যারা সেই অপরাধের হেতু বা প্রবর্তক, তারা কি সম্পূর্ণ নির্দোষ ?

আমার মনে হলো যে, সভ্য সমাজের পক্ষপাতিত্বই তাদের সমাজ-গঠনের মহা বিরোধী। এত দণ্ডের ব্যবস্থা থাকতেও তাই অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না।

যতদিন এক শ্রেণীর লোক তাদের স্বার্থজ্ঞান, তাদের

মৃত্যুপথের যাত্রী

পরিতৃপ্তিশূন্য লোভ, তাদের অবिवেচনা, তাদের হৃদয়হীনতা নিয়ে অপর দলকে সর্ববরকমে বঞ্চিত করতে থাকবে—যতদিন এই প্রথম দলের অযথা অত্যাচারে দ্বিতীয় দল তাদের জন্মগত, তাদের গ্ৰায্য অধিকার ভোগ করবার সুযোগ-সুবিধা না পাবে, ততদিন হাজার ধর্মের দোহাই, হাজার নীতিশাস্ত্রের কচকচি, হাজার আইন, হাজার শৃঙ্খলা সত্ত্বেও অপরাধ তারা করবেই। এই অপরাধই তাদের ধর্মযুদ্ধ,—তাদের জেহাদ।

তেজশঙ্কর একজন মহা অপরাধী। তাই সভ্য সমাজের আইন কঠোরতম দণ্ডে তাকে দণ্ডিত করেছে। কিন্তু এত বড় অপরাধী সে হলো কেন, সে কথা ত কেউ বিচার করে দেখেনি! নিতান্ত শৈশব থেকেই স্বার্থপর মানুষের সমাজ তাকে মানুষ জাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে শিখিয়েছে। তারা তাকে বুঝিয়েছে যে, এই জগতে দয়া, মায়া, মমতা, বিচার, বিবেচনা বলতে কিছুই নেই। ছলে, বলে, কৌশলে নিজের স্বার্থ-সাধনই মানুষের শ্রেষ্ঠ নীতি।

তারা তেজশঙ্করের শিশু বক্ষের কোমল পর্দার উপরে তারই রক্ত দিয়ে গভীর অক্ষরে লিখে দিয়েছে—“মানুষই মানুষের শত্রু। মানুষই মানুষের সর্বকষ্টের কারণ।” তার ফলে এখন যদি সে মানব-সমাজের বিরুদ্ধে খড়াহস্ত হ’য়ে থাকে, তা হ’লে সে দোষ কি তার একার?

কথাটা ভাবতেই এই সঙ্গে আরও হাজার কথা একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করে আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছিলো, কিন্তু তাতে বাধা পড়ে গেল। একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করে নেবার পর তেজশঙ্কর তার নিজের কথা আবার বলতে শুরু করলে।

শব্দ

তেজস্বীর বলছিল :—

বেলা তখন প্রায় দুপুর। মাথার উপর বৈশাখের জলন্ত সূর্য্য যেন চারিদিকে আগুনের রাশি ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাসের গায়েও ঠিক আগুনের হুকা। সেই তপ্ত বাতাস আমার মাথার উপর দিয়ে কেবলই গোঁ গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। এক একবার পিছন থেকে ঝাঝ দিয়ে সেই যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ এক অজানা চেনা অনিদিষ্টের পানে।

আমি গোঁ-ভরেই চলেছি এক দিক লক্ষ্য করে—অথচ কোন কিছুতেই আমার লক্ষ্য নেই। যেতে হবে, তাই যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি বা কোথায় যাচ্ছি, তা তখন ভাবে কে ?

মাঠের মধ্যে পথ বলতে বিশেষ কিছুই নেই। পথ কি অপথ, তাই বা তখন দেখছে কে ? কখনো আল, কখনো বা চষা ক্ষেত,—যখন যা সমুখে পড়ছে তারই উপর দিয়ে একটানা চলতে শুরু করেছি।

চলছি, আর ভাবছি আমার প্রাণ আমার বাবা, মা, আর আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচারের কথা। রামতারণবাবুর দুষ্ট-বুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতকতা, অবশেষে বিনা দোষে চোর বদনাম দিয়ে সারা দেশের লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ করা, তারপর বিনা বিবেচনায় আমার মত নিরীহ লোককেও সারা ছুনিম্নার মন্দাস্তিক উপহাস—এ সব কথা যতই আমি মনে মনে তোলপাড় করি, ততই

মৃত্যুপথের যাত্রী

আমার মনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহও যেন বিষের জ্বালায় জ্বলে যেতে থাকে। কখনও দাঁতের উপর দাঁত চেপে ধরি, কখনো নিজের অজ্ঞাতেই যেন নিজের হাত ছুটো মুষ্টিবদ্ধ ক'রে তাদ্দের বিরুদ্ধে উৎকট প্রতিহিংসা নেওয়ার কল্পনায় মেতে উঠি, কখনো বা কেউটে সাপের মত ফৌঁস ফৌঁস করে নিজের নাক দিয়ে জ্বালাময় নিঃশ্বাস ফেলতে থাকি।

এব উপরে আবার গ্রামবাসীদের অবিচারের স্মৃতি—তাদের হৃদয়হীন দুর্ব্যবহারের চিন্তা। বারো-তেরো বৎসরের একটা হতভাগ্য ছেলের সম্বন্ধে সামান্য একটা কুংসার কথা শুনেই তারা বিনা বিচারে তার উপরে এক মুহূর্তে খড়াহস্ত হ'য়ে উঠতে পারলো, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে লোক-পরম্পরায় তার প্রতি তার অভিভাবক বা নিকট-আত্মীয়দের অযথা নির্যাতনের বহু সংবাদ পেয়েও, তাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও পরের ঝগড়াতে মাথা গলিয়ে, সেই হতভাগ্য বালকটির প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারেনি! এরাই আমার পল্লীবাসী, এরাই আমার দেশের লোক।

ভাবতে ভাবতে একটা উৎকট প্রতিহিংসার সঙ্কল্পে আমার সমস্ত শরীরটা দৃঢ় হয়ে উঠল। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম—না, না, আমি নিজের সুখ চাই না। নিজের জীবনেও আমার আর মমতা নেই। কিন্তু যারা আমাকে শৈশব থেকেই এমন ভাবে উৎপীড়ন করে এসেছে, তাদের ধ্বংস আমি দেখবোই—যেমন করে পারি, তাদের সর্বনাশ-সাধন আমি করবোই।

পাগলের মত এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আপন মনে আবোল-তাবোল বকছি আর ১এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো মাঠ ভেঙে

ষড়্‌গণের যাত্রী

হন্ হন্ করে চলছি কোন্‌দিকে, তা তখন আমার খেয়ালই ছিল না।

বৈশাখের দুপূর্ব। বিশেষতঃ কয়েক মাস যাবৎ বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই! জলের জন্তে হাহাকার করতে করতে পৃথিবীর বুক শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। সারা মাঠের জমি হয়ে উঠেছে ফুটিফাটা। আমার বুকও দারুণ তৃষ্ণায় সেই রকম ফাটবার উপক্রম করলেও, সে কষ্টেব দিকে আমার তখন লক্ষ্য ছিল না। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, বিতৃষ্ণার কথা ভাবতে ভাবতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলেই গেছলাম। নইলে সেই কিশোর বয়সে, সেই প্রতিকূল অবস্থায়, ছয়-সাত ক্রোশ মাঠ ভেঙে, কোন অনিশ্চিত আশ্রয়ের অভিমুখে চলা আমার পক্ষে বোধ হয় সম্ভবপর হতো না।

ক্রমে দিনের আলো নিভে এল। পশ্চিম আকাশে লালের আভা ছাড়িয়ে সূর্য্যদেব দিক্‌-চক্রবালের আড়ালে গা ঢাকা দিতে লাগলেন। আমার মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বক, বিল-হাঁস আর পানকৌড়ির দল তাদের বাসার দিকে উড়ে যেতে লাগলো। গাছে গাছে হাজার পাখীর কিচিমিচি।

বুঝলাম, রাতের আব দেবী নেই। এখনই একটা গ্রাম না পেলে, এই মাঠেব মাঝেই আমাকে রাত কাটাতে হবে। সব চিন্তা ঘুচে গিয়ে তখন আমার মনে ভয় এসে গেল। হাজার দুঃখের জীবন হোক্, তবু মাত্র চৌদ্দ বছরের ছেলে আমি। আমার মনে এমন অসহায় অবস্থায় ভয় না হয়ে কি পারে?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঠিক সেই সময়ে আমার চোখে পড়লো একটা গ্রামের চিহ্ন। আমার দক্ষিণে প্রায় পোয়া মাইল দূরে

মৃত্যুপথের যাত্রী

অনেকগুলো আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ আর ওই সঙ্গে ছ’-একটা গোলাঘরও দেখতে পেলাম। তখন কোনও রকমে “পড়ি কি মরি” করতে করতে সেই গ্রামটিতে গিয়ে ঢুকলাম।

প্রথমেই দু-চারটে বাগান, বাঁশঝাড়, ডোবা, আগাছায় ভরা পতিত জমি। তাদের পাশ দিয়ে এঁকে-বঁেকে ঘুরপাক খেতে খেতে সরু মাটির পথটা ক্রমেই চওড়া হয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে। সেই পথ ধরে চলতে চলতে শুনতে পেলাম গ্রামের কুলবধূরা ঘরে ঘরে সাক্ষাৎপ্রদীপ জ্বলে শাখে ফুঁ দেবার আয়োজন করছে। বৃকে একটু আশা হ’লো যে, এতগুলি ভদ্র গৃহস্থের বাস যখন এই গ্রামে রয়েছে, তখন আমার মত একটা নিরাশ্রয় ভদ্রসন্তান অন্ততঃ আজ রাতের মত একটু আশ্রয় আর ছ’-মুঠো ভাত পাবে নিশ্চয়। আশায় বুক বেঁধে তাই কোন রকমে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চললাম।

একটু পরেই এসে পড়লাম একটা কোঠা-বাড়ীর সমুখে। দেখলাম, এক প্রোঢ় ভদ্রলোক বাড়ীর সুমুখে পথের পাশে দাঁড়িয়ে হুকোয় তামাক টানছেন। ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ—তাঁর গলায় পৈতে। তাতে আবার এক খোলো চাবি বাঁধা। মনে করলাম, এঁর কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করি। যে রকম অবসন্ন হ’য়ে পড়েছি, তাতে আর এক পাও এগোনো আমার পক্ষে মহাকষ্টকর।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই তিনি কটমট করে আমার দিকে চাইতে চাইতে বলে উঠলেন :

“কে হে ছোকরা ? তোমাকে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। বলি, যাবে কোথায় ?”

মৃত্যুপথের যাত্রী

ভাবলুম, ভাঙ্গলোক বোধ হয় খুব দয়ালু।, তাই তিনি আপনা হ'তেই জানতে চাইছেন যে, রাত্রিকালে এই বিদেশে যাথার্থই আমি আশ্রয়প্রার্থী কি না। তা হ'লে হয়তো তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত।

রীতিমত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম—“আজ্ঞে, অনেক দূর থেকে আসছি। সারাদিন খাওয়াও হয়নি। রাত হয়ে আসছে দেখে এই গ্রামে এসে ঢুকেছি। যদি কোথাও আশ্রয় পাই তো সেখানেই রাতটা কাটিয়ে আবার সকালে চলা শুরু করবো।”

ভাঙ্গলোক মুকুবিয়ানার সঙ্গে ঘাড় নাড়তে নাড়তে কর্কশ স্বরে বল্লেন—“ঠিক, ঠিক। যাবার সময় যার যা পাও হাতিয়ে নিয়ে স'রে পড়তেও কসুর করবে না, কেমন? তুমিও তা হলে তাদেরই দলের?”

অবাক হয়ে গেলাম। কাদের কথা ইনি বলছেন? আমাকেই বা তাদের দলের একজন বলে মনে করছেন কেন? বিশেষ, যার যা পাই হাতিয়ে নিয়ে স'রে পড়বার কথাই বা বলেন তিনি কি ভুলে?

প্রশ্নগুলি মনে মনেই তোলপাড় করে নিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে বললাম—“আজ্ঞে, কাদের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না তো। তবে আমার সঙ্গী কেউ নেই। আমি একাই আসছি।”

“বেশ করেছ! তুমি তা হ'লে একাই একশো। কিন্তু এ-সব চালাকি তো চলবে না ধন। ভাল চাও তো গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। নইলে দফাদার ডেকে এখনি ধরিয়ে দেব। যাও।”

মৃত্যুপথের যাত্রী

বজ্রগম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি বলে, তিনি হাত তুলে আমাকে গ্রাম থেকে বেরুবার আদেশ আর পথ ছই-ই জানিয়ে দিলেন।

আমার তখন গা টলছে। মাথাও ঘুবছে বন্বন্ করে। সারাদিন অন্ন-জলের মুখ দেখিনি—তার উপবে ছয়-সাত ক্রোশ হেঁটে এসেছি। কাজেই আর কোন উত্তর না দিয়ে আমি আবার চলতে লাগলাম।

একটু যেতেই দেখলাম একটা পাকা-বাড়ীর বারান্দা। পথের ঠিক ধারেই সেই বারান্দাটিতে সতরঞ্চ পেতে একদল যুবা খুব সোরগোলের সঙ্গে পাশা-খেলা শুরু করেছে। “কচে বারো”, “ছ’ তিন নয়” চাঁৎকারে তারা সেই স্থানটিকে বেশ সরগরম করে তুলেছে।

আমাকে সেই বাড়ীটির সুমুখ দিয়ে যেতে দেখে হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি খরদৃষ্টিতে চাইতে লাগল। শেষে বললে—“কে যায়? কোথায় বাড়ী হে ছোকরা?”

বললাম, “আজ্ঞে, আমার বাড়ী ভিন্ গাঁয়—এখান থেকে ছ’-সাত ক্রোশ দূরে।”

“বটে? তা এ-গাঁয় এসেছো কি জন্তে? সি দ দেবে? দাঁড়াও তো হে ছোকরা! দেখি তোমার চেহারাটা একবার।”

কথা বলতে বলতে সে একটা হারিকেন নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল। তারপর সেই আলোয় বেশ করে আমায় দেখতে দেখতে বললে—“হাঁ, যা ধরেছি তাই। চোর না হলে এমন ঝড়ো চেহারা হয়? তা, যাচ্ছে কোথায়? কার বাড়ী আজ অতিথ হবে ভাবছো?”

মৃত্যুপথের যাত্রী

দেখলাম ব্যাপার সুবিধের নয়। এরও ঠিক সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটির মত কথার ভাব। তবু চুপ করে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে বললাম—“আজ্ঞে, যাঁর দয়া হবে...নিতান্ত দায়ে পড়ে এসেছি—রাতের মত একটু আশ্রয় পাবো এই আশা করে। আবার সকাল হলেই—”

“হ্যা হ্যা হ্যা! সকাল হবারও দরকার হবে না, কিছু জাতাতে পারলেই গা-ঢাকা দেবে। তা কি আর বুঝি না? কিন্তু সে মতলব আর খাটছে না। আমি তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!”

এই মাত্র বলেই সে খপ্প করে আমার কৌচার কাপড়টা ধরে ফেলল। তারপর হাঁকল—

“ওকে নফর! ও গোবিন্দ! এসো, এসো। আজ ধরেছি এক ব্যাটা বদমাসকে। এসো, এর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করা যাক।”

সুবার কথা শেষ হতে না হতেই হৈ-হৈ করে আরও তিন চারজন খেলোয়াড় পাশা ফেলে আমার কাছে ছুটে এল। একজন আমার একটা কান সজোরে টেনে ধরে বলল :

“কি যাচ্। বড্ড লোভ লেগে গেছে, না? তাই আজ আবার এসে জুটেছি।” সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠলো—“দাও না বেটাকে বেশ করে খাবড়ে! তারপর ওকে দিয়ে এসো পঞ্চায়েতের কাছে। বেটা টের পাক্ মজা।”

কথা শেষ করেই সে আমার ছই গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে শুরু করলে।

মৃত্যুপথের যাত্রী

একেই তো আমার শরীরটা তখন ক্ষিদেয় আর পরিশ্রমে ঝিম্ ঝিম্ করছে, তার উপবে সেই নিশ্চয় চড়। মাথা ঘুরে, হু' চোখে অন্ধকার দেখে, আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

কতক্ষণ জুয়ে ছিলাম জানি না। জ্ঞান হ'লে দেখি, আমার চারিপাশে ইতব-ভদ্র অনেকগুলি লোক জড় হয়েছে। একজন খোঁড়া ভিখারী-গোছের লোক একটা টিনের মগে ক'রে আমার মাথায় জল দিচ্ছে।

অনেকে অনেক কথাই বলাবলি করতে লাগল। বুঝলাম, তারা সকলেই ধরে নিয়েছে যে আমি চোর, আব তাদের গ্রামে চুকেছি চুরির মতলবেই। কিন্তু আমার কাছে চোরাই মাল কিছু না থাকায়, কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করে আমাকে পুলিশে চালান দেওয়া যায় না। তবে আমাকে সেই রাত্রে গ্রামে থাকতে দিতে তারা মোটেই রাজী নয়। কাজেই আমাকে গ্রাম থেকে দূর করে দিতেই তারা কৃতসঙ্কল্প।

চৈতন্য পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই তারা আমাকে একটা সরু পথ দেখিয়ে বলে—“ভাল চাও তো এই পথ ধ'রে গ্রামের বাইরে চলে যাও—বুঝলে ছোকরা? ফের যদি তোমায় এ গ্রামে দেখে তো তোমার হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় করে ছাড়বো, যাও, যাও বলছি।”

তখনও আমার গা টলছে—শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে
উপায় কি? সেই অবস্থায় টলতে টলতে সেই সরু
আবার সেই মাঠের দিকেই চলতে লাগলাম।

গ্রামের সীমা পার হ'য়েই একটা চওড়া কাঁচা রাস্তা। সেই পথে পা দিতেই শুনলাম, আমার পিছন থেকে কে ডেকে বলছে—
“ওগো বাবাঠাকুর! থামো। একটা কথা শুনে যাও।”

ডাকার সুরটা কৰ্কশ মোটেই নয়—বরং যেন একটু সহানুভূতি মাথা। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটা আমার কাছে আসতেই চিনলাম—সে সেই খোঁড়া ভিখারী, যে আমার মাথায় জল দিচ্ছিল।

ভিখারী বললে—“ভদ্র লোকদের কাছে তো খুব সেবাই পেলো। এখন এই রাত্তিরে যাবে কোথায়? ছ'ক্রোশের মধ্যে তো আর গাঁ নেই।”

বললাম—“না থাক্। মাঠ তো আছে? সেখানেই কোথাও পড়ে থাকবো। বনের শিয়াল-জুয়ারেরা এদের চেয়ে মন্দ ব্যবহার করবে না বোধ হয়।”

ভিখারী হাসলে। বললে :

“যা বলেছ বাবাঠাকুর! গরীবের ছুঃখ কেউ বোঝে না। গরীবকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, উল্টে বলে কিনা চোর! আমি কিন্তু দেখেই বুঝতে পারি, কে ভাল লোক আর কে মন্দ! তাইতো তোমার পাছে পাছে এলু বাবাঠাকুর।”

এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—“যাবে কোথায়?”

বেটাকে সে তো সামনেই। ওইখানে বটগাছের তলায় আমি থাকি। কাছে। ভিখারী মানুষ—আমার আর ঘরই বা কি, গাছতলাই বা কি।

কথা শুনেই কি বাবাঠাকুর! রাতটার মত আমার আড্ডাতেই মারতে শুরু। তেপান্তর মাঠের চেয়ে তো ভালো?”

মৃত্যুপথের যাত্রী



শেষে রাখতেই হলো, শুকনো পাতা আর ডালপালার সাহায্যে

ধৃত্যপথের যাত্রী

কতকটা আশ্বাস পেলাম। চৌদ্দ বছরের ছেলে—একা-একা মাঠে পড়ে থাকা কি সম্ভব? বললাম—‘সে তো ভালোই, কিন্তু তোমার কোন কষ্ট হবে না তো?’

—“শোনো কথা। গাছতলায় একা পড়ে থাকি। একটা সঙ্গী যদি জোটে, সে তো ভাল কথাই। কষ্টের বদলে তবু একটা বাতও তো একটু আনন্দে কাটবে। তুমি চলো বাবাঠাকুর, ওসব বাজে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।”

অগত্যা তার আড্ডাতেই এসে উঠলাম। গ্রামের শেষে, মাঠের ধারেই একটা পুকুর। তার পাড়েই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ চারিপাশে ঝুরি নামিয়ে অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। ভিখারীর সঙ্গে তারই তলায় এসে দাঁড়ালাম।

গাছের গোড়ায়, ছ’ পাশেব ছোটো মোটা মোটা ঝুরির মাঝখানে ভিখারীর আড্ডা। তাব মাথার উপরে খুব মোটা একটা ঝাল বন পাতাব বোঝা কাঁধে নিয়ে সেই আড্ডাটির ছাদের মত হয়ে আছে।

ভিখারী আমাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে। বলল—“বাবাঠাকুরের সারাদিন খাওয়া জোটেনি, তা তোমার চেহারায় দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা, এক কাজ কর বাবাঠাকুর! আমার ঝুলিতে চাল, আলু আর গোটা দুই বেগুন আছে। একটা মাথা-ভাঙা নতুন হাঁড়িও যোগাড় করে রেখে দিয়েছি। পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাও। তোমাবও হবে আমারও হবে—কি বলো?”

আমি আপত্তি করলাম। সে কি! একে দীন ভিখারী, তার

খোঁড়া। তার অতি কষ্টে ভিক্ষে-করা অন্ন ধ্বংস করতে হবে ? সে কিছুতেই হ'তে পারে না। প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু ভিখারী ভয়ানক জেদ করতে লাগলো। বললে—“তা হ'লে আমাকেও আজ উপোস দিতে হয় বাবাঠাকুর। ব্রাহ্মণের ছেলে, ভায় ছেলেমানুষ ! সারাদিন না খেয়ে আমারই কাঁছে শুকিয়ে পড়ে থাকবে, আর আমি মজা করে খেয়ে ঘুমুবো ? তোমার বড়লোকেরা তা পারে বাবাঠাকুর, কিন্তু আমরা দীন-দুঃখী, আমরা তা কিছুতেই সহিতে পারি না। তা হ'লে থাক্ রান্না, আমিও তোমার মত শুকিয়ে পড়ে থাকি।”

মুন্সিলের কথা ! আমার জন্যে গরীব বেচারী উপবাসে থাকে, তাই বা হয় কি করে ? আর আমিই বা ভদ্রসন্তান হয়ে দীন ভিখারীর সঙ্গে ভাগ বসাই কোন্ হিসেবে ? উভয় মুন্সিলে প'ড়ে গেলাম।

বিস্তর কথা কাটাকাটি করলাম, কিন্তু ফল কিছুই হ'লো না। ভিখারীর সেই এক কথা—“তুমিও সারাদিন খাওনি, আমিও না। এখন তুমি না খেলে আমিই বা খাবো কোন্ মুখে ? আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি, তুমি রাঁখে। না হয় এসো, ছ'জনেই শুয়ে পড়া যাক্।”

শেষে রাঁধতেই হ'লো। শুকনো পাতা আর ডালপালার সাহায্যে ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়ে বটপাতার থালায় বেশ তপ্তির সঙ্গে ছ'জনে খাওয়া শেষ করলাম। তারপর পুকুরে আঁচিয়ে, পুকুর থেকেই আঁজ'লা করে জল খেয়ে আবার গাছতলায় ফিরে এলাম। সারাদিনের উপবাসের পর ভিখারীর যত্নের নিবেদন-স্বরূপ সেই

গাছতলাব ভাতে-ভাত এত তৃপ্ত এনে দিল যে, আমার সেই চৌদ্দ বছর বয়সে এমন তৃপ্তিব খাওয়া একদিনও খেয়োঁছ বলে স্মরণ করতে পারলাম না।

তারপর দু'জনেই শুয়ে পড়লাম। ভিখাবীর সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল। শুনলাম, সেও এককালে গরীবই ছিল। একখানা আটচালা ঘর, গোয়াল, একটা ছোট পুকুর এবং বেষে দশেক ধানের জমি নিয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই তাব দিন কাটতো। গোলায় তার বছরের ধান মজুত থাকতো, আর তাব স্ত্রী নিজের হাতে লাউ, কুমড়ো, ঢেঁড়স, বেগুন, সীম, পুঁই ইত্যাদি শাক-সাজুর চাষ করতো বাড়ীর উঠানে আর তাব আশে পাশে। তাতে বেশ শান্তিতে তাদের দিন কেটে যেতো।

কিন্তু বরাত মন্দ, তাই চার বছর উপর্যুপরি হ'লো অভাব। গোলা শূন্য, ক্ষেতেও শস্য নেই। বাধা হলে গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কাছে বসতবাড়ী আর ধানের জমি বন্ধক দিয়ে নিতে হ'লো একগো টাকা। সে টাকা আর কিছুতেই শোধ হ'লো না। ভিখাবী আট-দশ কিস্তিতে প্রায় আশী টাকা তার ব্রাহ্মণ মহাজনকে দিয়েছিলো বটে, কিন্তু তাতে সুদটাও উশুল হয়নি—আসল তো দুবের কথা। শেষে তিনি গরীবের যথাসর্বস্ব নীলাম করে নিলেন। গরীব খোড়া তার স্ত্রী আর একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে পথে এসে দাঁড়ালো।

তারপর এক বৎসর যেতে না যেতে, না খেতে পেয়ে তার স্ত্রী আর ছেলে, একে একে সরে পড়লো। খোড়ার অথও পবমাষ। তাই সে নিজেই শুধু বেঁচে রইলো—এইভাবে ভিক্ষে করে খেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতে।

কল্পপথের বাড়ী

সারাদিনের উপবাস আর দারুণ পরিশ্রমের পর পেটে ভাত পড়তেই শরীর আমার একেবারেই এলিয়ে পড়েছিল। ঘুমে চোখ দুটো এমন জড়িয়ে আসছিলো যে, আমি চেষ্টা করেও চাইতে পারছিলাম না। কিন্তু ভিখারীর এই কথা শুনে আমার সে-ঘুম কোথায় চলে গেল, আর আমার শরীর যেন কিসের একটা মাদকতায় গরম হয়ে উঠলো!

ভাবলাম, কি সর্বনাশ! মানুষের উপর মানুষের এত অত্যাচার? সামান্য বিষয়ের লোভে গরীব গৃহস্থের এই রকম করে সর্বনাশ সাধন করলে! এরাই আবার ব্রাহ্মণ? এরাই আবার মুখে ধর্মের বুলি কণ্ঠে বেড়ায়? দুনিয়াটা তো কেবল কীকিবাজী, কেবল অবিচারের রাজ্য। নইলে এরাই আবার নিজেদের দেবতার সমকক্ষ প্রচার করে অপরকে অশুচি, অস্পৃশ্য করে দিতে সাহস করে? অস্পৃশ্য তো এরাই, যারা ভান করে শ্রেষ্ঠত্বের, কিন্তু ব্যবহার বাদের ইতর জাতির চেয়েও নিকৃষ্ট।

মনে পড়লো, আমিও তো কম অত্যাচার ভোগ করিনি! সংসার নির্ধ্যাতন। রামতারণবাবুর বিশ্বাসঘাতকতা, গ্রামবাসীদের অত্যাচার—একে একে সব কথাই আমার মনে উদয় হ'তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামের ভদ্র গৃহস্থদের আচরণের কথাও মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

মনে হলো, কি শূন্য! যারা বড়লোক, যারা ভদ্র, তাদের কি সকলেই এমন পাপের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি? তারা কি সবাই এমন শার্থপর? অশিক্ষিত, অসভ্য, আর দীন-দরিদ্র যারা, তাদের মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, কই, এ-সব ভদ্রনামধারী অবস্থাপন্ন

লোকদের মধ্যে তো তা নেই। তবু এরাই সভ্য আর গরীবেরা।
অসভ্য? হায় ভগবান, এই তোমাবিচার?

মনের আবেগে ভগবানের নামটা সভ্য সভ্যই মুখ থেকে বেরিয়ে
পড়েছিলো। ভিখারী তা শুনতে পেলো। বললে—“ভগবানকে
ডাকছো বাবাঠাকুর? ও-নাম আর কবো না। ভগবান নেই,
থাকলে কি আর এমনটা হতে পারতো? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,
জগতে যারা পরের সর্বনাশ করে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে
খাচ্ছে, তারাই বয়েছে বেশ সুখে আর শান্তিতে। আব, তোমাব-
আমার মত যারা নিজের দিকে চাইতে শেখেনি, যারা অধর্ম করতে
ভয় পায়, তাদেরই যত কষ্ট, যত অশান্তি। ভগবান থাকলে কি
এর একটা বিচার হতো না বাবাঠাকুর? তাই বলছি, ভগবান নেই।
ওটা যত সব ভণ্ড বদমায়েসদের ধাম্পাবাজী।

ভগবানের নাম নিয়ে, কিংবা তার দোহাই দিয়ে ছোটলোকদের
ভোলানো খুব সোজা। তাই এসব ব্রাহ্মণ আব ভদ্রলোকেরা ছোট-
জাতের কাছে ভগবান দেখিয়ে বেড়ায়; কিন্তু আসলে তারা-ই
ভগবানকে একদম মানে না। দেখছ না যারা যত ধর্মের বুলি
আওড়ায়, তারাট তত বেশী অধর্ম করে থাকে? নইলে ব্রাহ্মণ হয়ে
কি দীন-দরিদ্র শূদ্রের সর্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিতে পারত? অথচ তার
তো কোন ক্ষতি হয়নি। উচ্ছন্ন যেতে আমিই গিয়েছি। আমার
ছেলে, বউ, না খেতে পেয়ে পথেই পড়ে মরলো, আব তিনি দিবা
আরামে আমার সম্পত্তি ভোগ করে যাচ্ছেন।

শুধু কি তাই? শোনো বাবাঠাকুর! সে একদিনের তরে
আমাকে একমুঠো ভিক্ষেও দেয়নি। আবার বলে বেড়ায় যে,

আমি ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিতে গিয়েছিলাম, সেই মহাপাপে আমার এই দশা হয়েছে। ওঃ! তোমার ভগবান থাকলে এতটা কি তাঁর সহ্য হতো বাবাঠাকুর?”

ভিখারী আরো কত কথাই বলতে লাগলো। বুঝলাম, তার বুকোও একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ঢাপা পড়ে আছে।

যাক। শেষে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হতেই ভিখারী আমাকে ডেকে দিলে। বললে

“যেহেই তো হবে তোমাকে বাবাঠাকুর, তবে আর বেলা বাড়িয়ে লাভ কি? এখনি বরং ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ পথ চলতে পারবে। তুমি এই মুখে যাও। ইদিকে ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে ছ'একটা বড় গ্রাম আছে। সেখানে হয়তো তোমার কোন উপায় হতে পারে। না হয়, আরও কয়েক ক্রোশ গেলে ভাল সহর পাবে। সেখানে কাজকর্ম কিছু পেলেও পেতে পারো।”

তারপর সে তার বুলির ভিতর থেকে একটা আধুলি বঁার ক'রে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে :

“এটা তোমার কাছে রেখে দাও বাবাঠাকুর। দেশের যে রকম হাওয়া, তাতে সব দিন যে ভাত জুটবে, তা মনে করো না। ছেলে-মানুষ—ক্ষিদ্র কষ্ট পাবে। এটা থাকলে তবু মাঝে মাঝে কিছু কিনে দিন কাটাতে পারবে। একদম রিক্ত হয়ে কি বিদেশ-বিভূঁয়ে যাওয়া চলে?”

আমি একেবারে লাকিয়ে উঠলাম। বললাম—“কি সর্বনাশ। দীন ভিখারী তুমি, আমাকে আধুলি দান করছ? আর আমি তাই

জাত পেতে নেবো ? তুমি বলো কি ! এও কি কখনো সম্ভব হতে পারে ?”

আমিও নেব না, সেও ছাড়বে না । অনেকক্ষণ ধ’বে উভয়েব মধ্যে কথা-কাটাকাটি চল্লো । শেষে সে বল্লে—“আচ্ছা বাবা-ঠাকুর । ধরো আমি তোমাকে আধুলিটা ধাব দিচ্ছি । তোমার যখন সময় হবে, তখন তুমি সুন্দ-আসলে এটা শোধ দিও । আমাকে নয়—আমি হয়তো ততদিন বেঁচে থাকবো না । আমার মত যে কোন গবীব, বা যে-কোন ছুঃখীকে দিলেই তা আমারই পাওয়া হবে ।

আমি মানি, আব আমি বিশ্বাস কবি যে, এই পৃথিবীতে যারা হতভাগ, যাবা দীন-হীন, তাবা সকলেই আমার ভাই, আমার আপনাব লোক । তুমিও যদি সেই হিসেবে আমাকে তোমার আপনাব মনে কবো, তা হ’লে আমার দেওয়া এই সামান্য সাহায্যটা আজ তোমাকে নিশ্চয়্য নতে হবে । নইলে বুঝবো যে, তুমি ভদ্র-ঘরেব ছেলে, তাই আমাকে ঘৃণা কব, অ’র সেই জন্যেই এটা নিচ্ছ না ।”

এব উপবে আব কথা চ’ল্লো না । দীন—ভিখারী আর নিঃশ্ব হলেও, সে আমার প্রতি যে উদারতা আর সহৃদয়তা দেখিয়েছে, এর আগে তেমনটি আব কোথাও পাইনি । এর কাছে ঋণী হওয়ায় লজ্জা নেই—ববং তা গৌরবেরই কল্পা ।

যাক্ । আধুলিটা নিতেই হলো । তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারই নির্দিষ্ট পথে পা চালিয়ে দিলাম । তার ব্যবহার আর তার উপদেশের কথা ভাবতে ভাবতে চার-পাঁচ-দ্রোণ পথ

মৃত্যুপথের যাত্রী

এক রকম বিনা কষ্টে অতিক্রম করে বেলা ছপূরের কিছু আগেই একটা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম।

নদীর ওপারেই একটা গঞ্জ। একটা খেয়া নৌকো প্রায় পনেরো জন যাত্রী নিয়ে ছাড়বার উপক্রম করছে। মাঝি তাড়া দিতেই কোন কিছু বিচার না করে তাড়াতাড়ি নৌকোয় গিয়ে উঠলাম।

নৌকোতে একটি বাবু-গোছের লোক আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। কয়েকজন ইঁতর শ্রেণীর লোক বোধহয় তাদের মজুরী নিয়ে তাঁর সঙ্গে ওকাতকি লাগিয়েছে। অবশেষে ভদ্রলোকটি একটা গঁজে বাঁর করে তাঁর টাকা-পয়সা গুণতে শুরু করলেন।

আমি সেই বাবুটির কাছ থেকে হাত ছুঁ দূরে বসে আছি। ভাবছি, সেই গঞ্জে গিয়ে কোন রকম কাড়কম্বা যোগাড় করা যাবে কিনা, না হয় তো আবার কোথায় যাবো, কি করবো ইত্যাদি।

ভিখারীর দেওয়া আধুলিটি বাঁর করে ভাবতে লাগলুম,—এ থেকে ছ’ পয়সা পারের জন্য দিতে হবে। তারপর অন্ততঃ ছ’ পয়সার কিছু খাওয়া চাই। ভিখারীর দয়ায় ৪।৫ দিন প্রাণটা কোন রকম করে বাঁচাতে পারবো। এর মধ্যে কোন উপায় কি আর হবে না? ওঃ! ভিখারী আমার কি উপকারই করেছে! এমন নিঃসহায় দীন-দরিদ্র, অথচ তার এতখানি মহৎ প্রাণ!

একমনে এই সব কথা ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ বাবুটি ব্যস্ত-ভাবে দেখাতে দেখাতে ব’লে উঠলেন—“ওই যা! আধুলিটা, আধুলিটা কে নিলে? এই যে এইমাত্র এখানে রাখলুম। কোথায় গেল?”

বাবুর সঙ্গে মজুরেরাও ব্যস্ত হ’য়ে উঠলো। খোঁজ, খোঁজ, কিন্তু

সেটা পাওয়া গেল না। বাবুটি বল্লেন, “সে কি কথা! এঠমাত্র বা’র করলাম, আর উড়ে গেল? তা হ’তেই পারে না। নিশ্চয় তোরা কেউ সরিয়েছিস। দেখি, তোদের গাঁট দেখি।”

মজুররা ভয়ে ভয়ে তাদের সব দেখালে। কিন্তু আধুলি বেকলে না। তখন সন্দেহটা আমার উপর এসে পড়লো। বাবুটি বল্লেন—
“এই ছোকরাটিকে তো চিনি না। অথচ এ আমাদের এক রকম গা ঘেঁসেই বসে আছে। ওর কাপড়-চোপড় বেড়ে ঝড়ে দেখতো।”

তখন সবাই মিলে আমাকে নিয়ে পড়লো।

ভিখারীর দেওয়া আধুলিটা আমার কৌচার খুঁটেই বাঁধা ছিল। খোঁজাখুঁজির ফলে সেইটে তারা টেনে বার করলে। তখন “চোর! চোর! আধুলি চুরি করেছে” বলে তারা সকলে মিলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলে।

আমি কত বল্লান, কত দাবি করলাম, কিন্তু সে-কথা কে-ই বা শোনে, কে-ই বা মানে? বিশেষ, ভিখারীর কাছ হতে আধুলি পেয়েছি শুনে তারা উপহাসের হাসি হাসতে লাগলো।

বাবুটি রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে মার খেলান খুব। সঙ্গে সঙ্গে আধুলিটাও তিনি কেড়ে নিলেন। বল্লেন—“যা বেটা চোর! অন্য কেউ হ’লে তোকে পুলিশে দিত। কিন্তু আমি নিতান্ত ভাল মানুষ বলেই তোকে ছেড়ে দিলাম। সাবধান, আর কখনো পরের ধনে লোভ করবি না।”

তারপর নৌকো ঘাটে লাগতেই তারা সব চলে গেল। মাঝি খেয়ার পয়সা চাইতেই আমি মুস্থিলে পড়ে গেলাম। বল্লাম,—

মৃত্যুপথের বাঁদী

“দেখলে তো ? আমার কাছে একটি মাত্র আধুলি ছিল, তাও বাবুটি মেরে ধরে কেড়ে নিলেন। আমি এখন পারের পয়সা কোথা থেকে দেবো ?”

মাঝি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কি সে বুঝলো, তা সেই জানে। শেষে বললে—“কি জানি বাবু! ওরা বললে, তুমি চুরি করেছ। কিন্তু তোমার মুখ দেখে আমার তা মনে হয় না। যাই হোক, তোমাব কাছে যখন আর পয়সা নেই, তখন আর ধরপাকড় করেই বা কী হবে ? যাও—তোমায় আর পয়সা দিতে হবে না।”

মনে ভাবলাম, মাঝির কাছে যে আর মার খেতে হলো না, এই আমার পরম সৌভাগ্য। যা হোক, ভিক্ষুকের দেওয়া এত বড় একটা শেষ সম্বল—আধুলি হারিয়ে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে অল্প মনে মনে ভজলোকটির মুণ্ডপাত করতে করতে আমি বিমর্ষ মুখে গঞ্জের দিকে চলেলাম।

সকাল

পারের ঘাট থেকে রশি ছুঁই দূরেই গঞ্জ। সেদিন হাটবার। তুপুর হুঁতেই হাট বেশ জমে উঠেছে। লোকে লোকারণ্য। বেচা-কেনা খুব জোর চলছে। হরেক রকম তরি-তরকারী, ফল-মূল, মাছ, খাবার আর শিল্পদ্রব্য এক-এক স্থানে স্তুপীকৃত হয়ে রয়েছে। বিস্তর কাঁকামুটে সারা হাটময় ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে।

মৃত্যুপথের যাত্রী

সবাই মহা ব্যস্ত। সকলেই একটা না একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে আমিই কেবল উদ্দেশ্যহীন। আমার না আছে পয়সা, না আছে শোন কাড়। কেবল দারুণ ক্ষুধার জ্বালা আমার পেটের মধ্যে আগুনের মত জ্বলছে।

নিকপায় ভাবে সাব্বা হাটময় আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। বস্তা বস্তা মুড়ি, মুড়কী, বাতাসা পাটকারী দরে বিক্রি হচ্ছে। আমি সতৃষ্ণ নয়নে কেবল চেয়ে দেখি। রাশি রাশি পাকা কলা, আম, কাঁঠাল, জাম, জামকল ইত্যাদি স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। লোলুপ দৃষ্টিতে আমি কেবল সেগুলির দিকে চেয়ে দেখি। পয়সা নেই যে, সামান্য কিছু কিনে খাই, আবার কারো কাছে চাইতেও সাহস হয় না—কি জানি, শেষে কি আবার হাটের মধ্যে মার খেয়ে ম'রবো ?

তখন আধুলিটার কথা কেবলই মনে হ'তে লাগলো। ভায় রে! সেটা থাকলে কি আজ আমাকে এই হাটের মধ্যে ক্ষিদেয় কষ্ট পেতে হ'তো? ছ'পয়সার কিছু খেয়েও তো জল খেতে পারতুম? আমার কষ্ট হবে ভেবেই সেই দীন ভিখারী তার সামান্য পুঁজি থেকে তা দান করেছিল! আর সেটা কিনা একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক জোর করে ছিনিয়ে নিলে? তাও এমনি নয়—রীতিমত মার দিয়ে।

কথাটা মনে হতেই, বুকটা আমার টন্ টন্ করে উঠলো। চোখ ফেটে আপনা আপনিই ঝরে পড়লো কোঁটাময়ক চোখের লোনা জল। এখটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, এক স্থানে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময়ে একটি

বুড়াপথের বাড়ী

ভদ্রলোক প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল হাতে করে আমার কাছে এসে বসেন :

“ওহে ছোকরা। মোট নিবি? এই কাঁঠালটা নিয়ে যেতে পারবি?”

বল্লাম—“আজ্ঞে হ্যাঁ। কতদূর যেতে হবে?”

ভদ্রলোক বলেন—“এই কাছেই। আধপোয়াটুক পথ হবে। নে. ধর্—ছ’-পয়সার বেশী পাবি না কিন্তু।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠালটা তিনি আমার মাথায় চাপিয়ে দিলেন। আমিও কোন ওজর আপত্তি না করে, কাঁঠাল নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চললাম।

ভদ্রলোক বলেছিলেন “আধপোয়া পথ”; কিন্তু চলতে গিয়ে দেখি যে, আধপোয়া পথ আর ফুরোয় না। তিন-চারটে মোড়, দুটো বাগান পার হয়ে একমাইলের উপর এলাম, তবু তাঁর বাড়ির নাগাল পেলাম না! এদিকে প্রায় পনেরো সের ওজনের কাঁঠালটা আমার মাথায় ক্রমেই চেপে বসতে লাগলো। পেটে অন্ন নেই, মাথায় দারুণ বোঝা—চৌদ্দ বছরের ছেলের পক্ষে সেটা সোজা কথা নয়।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন—“ওই যে সুমুখে ওই বটগাছ; তার ও-পাশেই। এরই মধ্যে এলিয়ে পড়লি? আচ্ছা বাবু মুটে তো! দুটো পয়সা কি এল্লি আসে হে ছোকরা? রোজগার এত সোজা নয়।”

শরীরটা যেন রি-রি করে উঠলো। আচ্ছা পাষণ্ড লোক তো! ইনি আবার ভদ্রলোক? হাড়ী, মুচি, চামারদের যেটুকু বিচার-

মৃত্যুপথের বাড়ী

বিবেচনা আছে, এঁর তার শতাংশের এক অংশও নেই। তবু ইনি বাবু ?

যাক্। আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে গজ্জ্বাতে গজ্জ্বাতে কাঁঠাল নিয়ে চলতে লাগলাম।

আরও পোয়াটাক গিয়ে তাঁর বাড়ী পেলাম। কাঁঠালটা তিনি ঘরে তুল্লেন, কিন্তু পয়সা দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমার তখন ক্ষিদে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভাবছি পয়সা ছুটো পেলেই যা হোক কিছু কিনে খাবো। একটা চিড়ে-ঝুড়কীর দোকানও সেখানে রয়েছে দেখলাম। কিন্তু পয়সা যে তিনি-দেবার নামটি করছেন না। ব্যাপার কি ?

শেষে আর সহ্য হ'লো না। বললাম—“দিন না মশাই পয়সা ছুটো! আধপোয়া বলে দেড় মাইল তো টেনে আনলেন। এখন পয়সা ছুটো দিন।”

তাতেই ভদ্রলোকের মানে ষা লেগে গেল। মুচি-মুদ্দফরাসের মত আচরণ করতে লজ্জা হয় না, কিন্তু গরীবের মুখে একটি ত্রাণ্য কথা শুনলেই মহা অপমান হয়ে পড়ে। দেখলাম যে, ইনি সেই রকমের ভদ্রলোক। আমার কথায় রেগে গিয়ে তিনি উত্তর করলেন :

“কি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। আমি ভোর কাছে মিথ্যে কথা বলেছি? ব্যাটা ছোটলোক। ব্যাটা পাজী।”

বললাম—“আজ্ঞে হ্যাঁ। ছোটলোক না হ'লে, মোট বইতেই বা আসবো কেন? তা, পয়সা ছুটো দিন। আমায় আবার অতদূর ফিরতে হবে তো?”

বাবুটির গৃহিণী তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলে উঠলেন—“বাবা। এতটুকু ছেলে, টক্ টক্ কবে উত্তব করে তো খুব। সাথে কি বলে ছোটলোক? তা বাছা! তোমার পয়সা কি দেবো না বলেছি? তবু শুধু একটা কাঁঠাল বয়েই ছ’-ছোটো পয়সা নেবে? এই চালা কাঠ ক’টা হলে দাও, পয়সা দিচ্ছি।”

তিনি আমাকে উঠানেব মাঝখানে বাশীকৃত প্রায় এক গাড়ীটাক চালা কাঠ দেখিয়ে দিলেন।

কি সর্বনাশ! এই কাঠের বংশ আমায় তুলতে হবে? তবে আমি পাব মজুরীর ছটো পয়সা? এরা মানুষ না পিশাচ? ভাবলাম, এদের পয়সার মাথায় ঝাঁটা মেয়ে তখনই চলে আসি। কিন্তু তখন বড়ই নিকপায়। তেমন অবস্থায় ওই ছটো পয়সা আমার কাছে ছ’টাকা। কাজেই তাব মায়া ছাড়তে পারলাম না।

আধঘণ্টা খেটে, কাঠগুলো তুলে দিলাম। তাতেও নিকৃতি নেই! যেমন চামার বাবু, তেমনি চামারাগী তাঁর গৃহিণী! তাব আদেশে শেষে উঠোনটাও ঝাঁট দিয়ে তবে রেহাই পাই। ভদ্রলোকেরা গরীবদের খাটিয়ে কি রকম মজুরী দিয়ে থাকেন, সেদিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম।

তখন অপরাহ্ন হয়ে গেছে। ক্ষিদেয় আব দাঁড়াতে পারছি না। পয়সা ছটো পেয়েই, সেই দোকান থেকে ছ’ পয়সার যবের ছাতু কিনে নিলাম। নিকটেই একটা পুকুর ছিল। কৌঁচার মুড়ায় ছাতু বেঁধে সেই পুকুরের জলে ডুবিয়ে তা ভিজিয়ে নিলাম। তারপর রাধসের মত সেগুলো খেয়ে, আঁজলা আঁজলা করে পুকুরের জল পান করতে, তবে প্রাণটা বাঁচলো।

কিন্তু দেহ আর বইতে চায় না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। যেখানে হোক এক জায়গায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অপরিচিত গ্রামে থাকতে সাহস হয় না। আবার কি চোরের বদনাম নিয়ে মার খেয়ে ম'রতে হবে? এ গ্রামের একটা গৃহস্থের যা নমুনা দেখলাম, তাতে এটা ভদ্রপল্লী বলতে ইচ্ছা হয় না। অগত্যা আবার সেই গঞ্জের দিকেই চলতে সুরু করলাম।

তখন হাট ভেঙে গিয়েছে। বড় বড় চালাগুলো সব খালি। তারই একটাতে কতকগুলো কুড়োনো খড় পেতে বিছানা তৈরি করে নিলাম। দেহটা ক্লান্ত হয়েছিল খুঁই। কাজেই শুতে না শুতে একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। এক মেথর আর এক মেথরাণী হাট ঝাঁট দিতে সুরু করেছে। আমাদের দেখে মেথরাণী বললে—“তুমি তো দেখছি বেশ ভদ্রলোকের ছেলে বাবু! তবে হাটের চালায় একা একা শুয়েছিলে কেন? এখানে যে নেকড়ে বাঘ আসে বাবু!”

বললাম—“কি করি বলো? বিদেশী লোক। কেউ হয়তো বিশ্বাস করে জায়গা দেবে না। তা' এই হাটেই পড়ে ছিলাম।”

মেথরাণী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে বইলো। পরে বললে—“যাবে কোথায়?” বললাম—“বেরিয়েছি কাজের সন্ধানে! কোথায় যে কাজ মিলবে, তা তো জানি না।”

“ওরে মোর কপাল! তুমি কাজ খুজতে এসেছ এই গাঁয়ে? এখানে সব চাষী লোকের বাস। ভদ্রর নোকেরাও চাষবাস করে খায়। এখানে কি চাকরী মেলে? তবে যদি রায়পুরে যেতে

যুত্বপথের বাতী

পারো তো এক-আধটা কাজ মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু সে তো এখান থেকে পনেরো ক্রোশ! পারবে ততদূর যেতে?”

পনেরো ক্রোশ? বাবা! সে তো তা হ'লে ছ'দিনের পথ! এ ছ'দিন আমি কি খেয়ে পথ চলবো? তারপর সেখানে পৌঁছলেই তো আর কাজ মিলবে না। সে কয়দিনই বা কি করে চলবে? পোড়া পেটই দেখাছ আমার কাল হ'য়ে উঠলো।

আধুলিটার কথা আবার মনে পড়লো। খোঁড়া ভিখারী এই কথা ভেবেই তার সামান্য পুঁজি থেকে আমাকে সেটা দান করেছিল। সে ভুক্তভোগী, নিঃস্বলের যে কত কষ্ট, সে তা ভাল রকমেই জানত। আর সে আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবেসেছিল। প্রবাসে, অনির্দিষ্টের পানে চলতে গিয়ে পেটের চিন্তাটাই যে আমার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, সে তা স্পষ্ট ভাবেই বুঝে নিয়েছিল। তাই আমাকে সে চিন্তার হাত থেকে যথাসম্ভব নিষ্কৃতি দেবার জগ্গেই এমন পীড়াপীড়ি করেও সে তার কত দিনের ভিক্ষার সঞ্চয়টি অবাধে, সরলান্তঃকরণে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—“দেশের যে রকম হাওয়া, তাতে সবদিন যে ভাত জুটবে, তা মনে করো না। ছেলেমানুষ—ক্ষিদেয় কষ্ট পাবে; এটা থাকলে তবু মাঝে মাঝে কিছু কিনে খেয়ে দিন কাটাতে পারবে। একদম রিক্তহস্ত হয়ে কি বিদেশ-বিড়ুয়ে যাওয়া চলে?”

ওঃ! ভিখারী কতখানি চিন্তাই করেছিল আমার জগ্গে! কিন্তু আমার বাবা কখনো আমার জগ্গে এর সিকি ভাবনা ভাবেননি; জ্ঞাতিরা তো নয়ই। এক ছিল ইচ্ছের মা, যে তার শক্তি দিয়ে সাধ্যমত আমার উপকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার

মৃত্যুপাণ্ডের মা'এ



বাতের অন্ধকা'বে লাঠি'ব ওপ'ব ন'ব দিম্বে কোশে'ব প'ব কোশ খা'ব এগিয়ে চলে

মৃত্যুপথের যাত্রী

ভাগ্যদোষে হঠাৎ মৃত্যু এসে তা'কে তুলে নিয়ে গেল। এই কি ভগবানের বিচার? সাথে কি ভিখারী বলেছিল যে, ভগবান্ নেই? ওটা যত সব ভণ্ড বদ্মায়েসদের ধাম্পাধাজি? ভগবান্ থাকলে কি আর সেই ভিখারীর দেওয়া আধূলিটা আমার মত নিঃসহায়, নিঃস্বল দীন দরিদ্রের হাত থেকে একটা অজানা, অচেনা, অর্থবান ভদ্রলোক মারধোর করে ছিনিয়ে নিতে পারতো?

একমনে এট রকম কত কথাই ভাবছি দেখে মেথরাণী বলে—
“বুঝেছি বাবু। তুমি বড় ভাবনায় পড়েছ। কিন্তু কি করবে বলো? গরীবের ভাবনা ছাড়া আছেই বা কি? তা এক কাজ! করো বাবু। তোমাকে দেখে আমার মায়া হচ্ছে, তাই বলছি।

ওই যে ওধারে একটা চালের আড়ং দেখছ, ওটা হ'লো হরিবাবুর। তিনি খুব ভাল লোক। প্রতি হাটের পরদিন তিনি তাঁর এক গাড়ী কবে ধান রায়পুরের ধানকলে পাঠান চাল তৈরী করাতে। আজও সেই রকম ধান যাবে। তাঁকে রাজী করাতে পারলে, চাই কি সেই গাড়ীতেই যেতে পারো। দেখ না, ওঁকে যদি রাজী করাতে পারো।”

পরামর্শটা মন্দ লাগলো না। দেখলুম, মেথরাণী হ'লে কি হয়, তার মনটা বেশ সরল, আর সে আমাকে সুযুক্তই দিয়েছে। তারই কথামত আমি হরিবাবুর কাছে গেলাম আর তাঁকে আমার দুর্দশার কথা খুলে বললাম।

হরিবাবু ধনী ব্যবসাদার হ'লে কি হয়, তিনি বাবু মোটেই নন। নিজেকে তিনি ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দিতেও চান না। পরণে

একটা আধময়লা পাঁচহাতি কাপড় আর গলায় মালা—কে বলবে যে, তিনি হরিবাবু আর অতবড় একজন আড়ৎদার ?

গলায় পৈতা দেখেই তিনি আমাকে একটা লম্বা-চওড়া প্রশ্নাম করে বসলেন। দেখলাম, ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি। অথচ এই ব্রাহ্মণেরাই আজকাল কত নীচ, কত হীন হয়ে পড়েছে ! হরিবাবু প্রশ্নাম করতেই এই কথা ভেবে আমার নিজেরই মনে লজ্জা হতে লাগলো—আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম।

যাক্। আমার সব কথা তাঁকে খুলে বললাম ! তিনি ভিত্তি কেটে উত্তর দিলেন—“সে কি ! আপনি ব্রাহ্মণ, তায় ছেলেমানুষ। বিদেশে এসে এমন মুস্কিলে পড়ে গিয়েছেন। আপনাকে একটু সাহায্য করবো, এ তো আমার ভাগ্যের কথা। টাকা নয়, কড়ি নয়, শুধু গাড়ীতে বসে যাবেন। তাতে আর আপত্তি করবার আছেই বা কি ? গাড়ী তো আমার যাচ্ছেই—তা নয় আপনি একজন সঙ্গী হ’লেন। সে তো ভাল কথাই। তা বেশ। যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন এবেলা এখানেই রসুই করুন, খান দান, তারপর বৈকালে রওনা হবেন। ব্রাহ্মণ মানুষ—দেখো। আমার বাড়ী এসে কি অভুক্ত থাকবেন ? তা তো হয় না।”

হাতে হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেলাম। ভাগ্যিস্ মেথরাণীর কথা শুনে এখানে এসেছিলাম। তাইতো এতটা সুবিধে হচ্ছে গেল ! মেথরাণীকে নীচ জাতি বলে ঘৃণা করলে কি আজ কষ্টের অবধি থাকতো ?

হরিবাবু যথেষ্ট সেবা করলেন। স্নানান্তে নিজেরই পাক করলাম আতপ চাল, ঘি, আলুভাতে, দুধ, চিনি, কলা—

একেবারে রাজভোগ! হরিবাবু আমারই পাতে প্রসাদ পেলেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম ব্রাহ্মণদের ওপর তাঁর এই ভাস্ক্র্য দেখে।

বৈকাল চারটের সময় মোষের গাড়ী ছাড়লো। গাড়ীতে বাত্রিশ বস্তা ধান। সওয়ার আমি, আর একটা গাড়োয়ান। গাড়োয়ানকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়ে, হরিবাবু আমায় আবার প্রণাম করলেন। তারপর প্রণামীস্বরূপ আমার হাতে দিলেন একটি টাকা। বল্লেন— “ব্রাহ্মণ আপনি—অপরাধ নেবেন না, এটি আপনার পথে জল খাবার জন্তে।”

আপত্ত করতে সাহস হ'লো না। খুসী মনেই টাকাটা নিলাম। তারপর গাড়ী ছেড়ে দিলে।

এগারো

একে মোষের গাড়ী, তায় পুরোদস্তুর বোঝাই। কাজেই পথ যেন আর এগোয় না! বেলা চারটে থেকে চলতে শুরু করে, রাত বারোটোর সময় একটা আড্ডায় এসে থামলো। দুব-পথের গাড়োয়ানেরা সেইখানেই রেঁখে বেড়ে খায়। আমার সঙ্গী গাড়োয়ানটাও গাড়ী খুলে দিয়ে, মোষ ছটোকে জাব দিলে। তাবপর সে রান্না শুরু করলে।

আমার পেট তখনও ভার—কাজেই আমি আর কিছুই খেলাম না। ততক্ষণে ধানের বস্তার উপর শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে ল'গলাম। গাড়োয়ান খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার ছটোর সময় গাড়ী ছেড়ে দিলে।

যত্নপথের যাত্রী

রায়পুরের ধানকলে পৌছলাম পবদিন বেলা দশটায়। গাড়োয়ান তার নিজের কাজে মন দিলে। আমিও তাব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম ওই গ্রামের কোথাও একটা কাজের সন্ধান করতে।

কিন্তু সাবাদিন ঘুবেও কোন উপায় কবতে পাবলাম না। একে বিদেশী, তায় ছেলেমানুষ। কাজেই কথা বল্লই লোকে হেসে উড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। কেউ বলে—“চেহারাটা আছে ভাল—যাত্রার দলে মেশো না কেন হে ছোকরা! মাইনেও পাবে, আর খেতেও দেবে।”

কেউ বলে—“গরু চরাতে পারবে? বলো তো দাঁমু ঘোষকে বলে দি। সে তোমাকে পেটভাতে রাখতে পাবে।”

একটি বড়লোককে চাকরার কথা বলতেই তিনি মহা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বল্লেন—“নাঃ! যত সহ্য ঘরে ব্যাটারদের জ্বালায় দেশে আর বাস করা গেল না। যে ব্যাটা আসে, সেই বলে ‘দাও চাকরী’।”

তারপর তিনি আমাকে সজা কবে আবার বল্লেন,—“কি হে ছোকরা! জল তোলা আর বাসন মাজার কাজ করতে পারবে? এই জন পকাশের কাজ। প্রথম ছ'মাস মাইনে পাবে না কিন্তু—তা বলে দিচ্ছ। আর, এই দেশেবই কোন লোককে জামিন রাখতে হবে। পারবে?”

বুঝলাম, ওর কাছে চাকরার আশা করা বৃথা। কাজ যেমনই হোক, তায় আবার জামিন চাই। কাজেই নমস্কার করে চলে এলাম।

মৃত্যুপথের বাতী

এর পর তিন-চার দিন নানা জায়গায় চেষ্টা করতেই কেটে গেল।

হবিবাবুব টাকাটি আছে তাই রক্ষে। ছ' চার পয়সা করে খাই আর বাতে যেখানে হোক এক জায়গায় পড়ে থাকি। সারাদিন কাটে কেবল চাকরীর সন্ধান করতে করতে। শেষে একদিন একটা সামান্য গোছের চাকরী যোগাড় হয়ে গেল।

একটি কায়স্থ ঘরের মেয়ে বাপেব বাড়ী এসেছিলেন বেড়াতে। তাঁর কোলে একটি খোকা। তিনি আমাকে তাঁর শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যেতে চান। ছোল ধবা আব দোবান-বাজার করা—এই শুধু কাজ। তারপর বিশ্বাসী হয়ে থাকলে, তাঁর জমিদার শ্বশুরকে বলে আমার অনেক বিছু ভাল করে দেবেন। মাইনে, খোরপোষ আর ছুটো টাকা।

অন্য আশা আর নেই। কাছেই তাতে রাজী হয়ে গেলাম এবং পরদিনই তাঁর সঙ্গে আরো দশকোশ দূরে রাধানগরে চললাম চাকরী করতে। রায়পুরের পাশেই নদী। নৌকো চড়ে আমরা চললাম রাধানগরে।

রাধানগর

রাধানগরে এসে বুঝতে পারলাম যে, বড়লোকগুলি যেন আর এক ভগবানের সৃষ্টি। তাদের জীবনের আডম্বর খুব, কিন্তু তার মধ্যে হৃদয় নেই। স্বার্থপরতা তাদের শিরায়-শিরায়, অস্থিভে-অস্থিভে মজ্জাগত। নিজেদের সুখ-সুচ্ছন্দতা তারা এত বেশী

হুত্বপথের স্বাক্ষর

বোঝে যে, তার জগ্গে তারা গরীবদের রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ বলে স্বীকার করতেই চায় না।

মনে একটা প্রশ্ন হ'ল, বড়লোকগুলি কি গরীবদের শত্রু হ'য়ে জন্মে আছে? যে ক'টি বড়লোকের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাদের সবাই দেখছি ঠিক ঐরূপ।

যে মেয়েটির স্বশ্রুতবাড়ী চাকরী করতে এসেছি, তাঁরা খুব বড়লোক—জমিদার। আমার মত অথবা পাঁচ-ছয়টি চাকর তাঁদের রয়েছে। আমাকে তাদের দলে ভর্তি হ'তে দেখে অবধি তারা ঠারে-ঠোরে আমাকে কত কি যেন বলতে চেষ্টা করতো। কিন্তু আমি তাদের কোন কথাই বোঝবার চেষ্টা করিনি।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম যে, সে-বাড়ীতে কাজ করা দুঃসাধ্য। বাড়ীর ছোট খোকাটি থেকে বুড়ো কর্তা পর্যন্ত প্রত্যেকেই এক একজন মস্ত মনিব। তাদের নানা জনের নানা ছকুম তামিল করা মানুষের সাধ্য নয়। আবার ছকুম পালনে এক মিনিট বিলম্ব কি ক্রটি হলেই আর রক্ষে নেই। হাতে মাথা কাটবার জগ্গে তখন বিশটা হাত 'রে রে রে' করে তেড়ে আসবে।

এদিকে কিন্তু চাকরদের খাওয়ার দিকে দৃষ্টি করবার মত লোক একজনও নেই। দুপুরের ভাত খেতে চারটে বেজে যায়—তাও যা খাবার, সে বুঝি কুকুরেরও অখাদ্য। ভোর বেলা কোন জলখাবারের নাম-গন্ধও নাই। তা ছাড়া, কথায় কথায় প্রহার আর ভাতবন্ধ, এ যেন প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বাবুদের আর বাড়ীর মেয়েদের কিন্তু সারাদিনই ভোজ লেগে আছে। তাঁদের যেমন রকমারী খাওয়ার ঘটা, তেমনি রকমারী

থেয়াল। তাঁদের পিছনে ছুটোছুটি করতে করতে এক ঘণ্টা জল খাওয়ারও সময় পাওয়া যায় না।

পনেরো দিন কাজ করলাম, তার মধ্যে পাঁচদিন ভাতবন্ধ। কানমলা, চড়-চাপড় তো আছেই। দু'দিন কর্তাবাবুর কাছে বেতও খেলাম বিলক্ষণ। অপবাধ, একদিন ধোয়া জাজিমের ওপর কালির দোয়াত উল্টে দেওয়া, আর একদিন একটা কলকে ভাঙা। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, একটা লোকও তার জন্তে একটু 'আহা উহু' করলে না!

চাকবীর সখ্ মিতে গেল, এখন পালাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু হাতে আর কিছু নেই। হরিবাবুর টাকার যে কয় আনা অবশেষ ছিল, তা বাবুদের বাজারে গচ্ছা দিতেই শেষ হয়েছে। ভাবলাম, পনেরো দিনের মাইনেটা যদি পাই, তাহলেও একটা টাকা হবে। তাই নিয়ে যেখানে হয় সরে পড়বো। তারপর যা আছে কপালে।

কিন্তু চাকরদেরই কাছে জানলাম যে, এ বাড়ীতে মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ নেই। তারা কেউ এক বছর, কেউ দু বছর কাজ করছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সা মাইনে ব'লে পায়নি। মাইনে চাইলেই চোর বদনাম নিয়ে পুলিশের গুঁতো খেতে হবে। দু-একজনের সেই দশাই হয়েছে।

কি সর্ব্বনাশ! এর নাম জমিদারের বাড়ী চাকরী? এর নাম বড়লোকের অন্ন? এখান থেকে পালাতে পারলে যে বাঁচি। কিন্তু পালাতে গেলেও লুকিয়ে পালাতে হবে। নইলে বাবুরা জানতে পারলে তখনই হয়তো কোন ফ্যাসাদে পড়ে যাব।

যাই যাই করে আরো ক'টা দিন কাটলো। সুযোগ আর আসে না। ইতিমধ্যে আরো অনেক বিছু দেখতে ও জানতে পেলাম। জমিদার যে কি ভয়ানক ভীষ, তা জেনে আমার সাবা দেহ আর মন বিষের জ্বালায় জ্বলে যেতে লাগলো।

ভাবলাম, সব জমিদারই কি এইরকম? তখনই সঙ্কল্প করলুম, “হে ভগবান! যদি কখনো সুযোগ পাই তবে এইরকম বড়লোকদের যেন সর্বনাশ করতে পারি। আমার জীবনের প্রধান সাধনাই যেন হয় অত্যাচারী বড়লোকদের সর্বনাশ-সাধন।”

তখন খাজনা আদায়ের ভরা মরশুম। লাটের কিস্তি মেটাবার জন্তে নায়ের, গোমস্তা, কারকুন, পাঠক, পেয়াদা সকলে পাগ্লা কুকুরের মত গরীব প্রজাদের ওপর হানা দিতে শুরু করেছে। খাতির নেই, কৈফিয়ৎ নেই, বিচার-বিবেচনা করবারও কিছু নেই। টাকা দাও—টাকা! টাকা! ধান হয়নি, পাট হয়নি অঙ্কুরা, অনাহার, রোগ, শোক, মৃত্যু—ওসব অছিল। চালের মটকায় তুলে রাখো। আগে টাকা বের করো, তারপর ওসব কথা! গরীব প্রজারা ছুটোখে অঙ্ককার দেখতে লাগলো।

বাবুরা একেবারে রুদ্র মূর্তি ধরে বসেছেন। প্রজাদের কান্নাকাটি, অহুসন-বিনয় কিছুতেই তাঁরা কান দিতে নারাজ। লাটের কিস্তির বেলা দয়ামায়া দেখাতে গেলে কি চলে? টাকা দাও—নইলে যে উপায়ে হোক, তা আদায় করে নেওয়া হবে।

এতদিন যা কিছু আদায় হয়েছে, তা সব বাবুয়ানী, সখ-সৌখিনতা, আর বদখেয়ালের পিছনেই গেছে। এখন প্রভার বুকের রক্ত শোষণ করে জমিদারী রক্ষা করা চাই। তাতে প্রজা

মৃত্যুপথের যাত্রী

মকক বা বাঁচুক, তা দেখবার ভার সেই জমিদারের নয়। তাই টাকা সংগ্রহেব জন্ম গরীব প্রজাদের ওপৰ জুলুম, অত্যাচার, অবিচার আর নিশ্চিন্ততার চরম অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল।

, নিত্য দেখি, পাইকরা জমিদার বাবু কাহে দলে দলে গরীব প্রজাদের ধরে আনছে। তাদের কি সাধা! কি দুর্গতি! কি কষ্টভোগ! কাউকে সারাদিন প্রচণ্ড বোদে দাঁড় কবিয়ে রাখা হয়েছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটবার উৎক্রম কবলেও হাজাব অনুময় সম্বোধন এক টোক জল তাকে সোব হুকুম নেই। কাউকে বা জল-বিছুটি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে—সে পাবত্ৰাহ চীংকার করতে কবতে লাফালাফি শ্রুত কবে দিয়েছে। আবার কারও ভাগ্যে নিশ্চিন্ত বৈত্ৰাঘাত। বেচারার সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত ও বক্তাক্ত হয়ে গেছে।

এদিকে প্রজাদের গোলা শূন্য কবে, তাদের খোরাকী ধান গাডী বোঝাই করে আনা হচ্ছে। তাবা হয়তো অল্পের অভাবে অনাহারেই মারা যাবে। কিন্তু সে বিবেচনা কববে কে? খাজনা দাও, নইলে এই ধান বেচে যতদূর সম্ভব তা আদায় করা হবে।

প্রজাদের গাউ, বাছুর, চাষের বলদ, ছাগল, ভেড়া—সব ধরে এনে জমিদারের খোঁয়াড়ে ভর্তি করা হচ্ছে। টাকা দাও, তবে এসব খালাস করে দেওয়া হবে। নইলে এসব নীলাম করে আদায় করা হবে জমিদারের খাজনার টাকা।

পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল, জোর-জবরদস্তির সঙ্গে উঠিয়ে আনা হচ্ছে। তার বেশীর ভাগই হয়ে যাচ্ছে লুট। অবশেষে যা থাকে, তা জমিদারের খরচের দাবীতেই শেষ হয়ে যায়। প্রজার দেনার এক কণাও তাতে শোধ হয় না।

যুত্পাথের বাড়ী

চক্ষের উপর এই সব রোজই দেখি, আর গায়ের জ্বালায় ছটফট করে মরি। ওঃ! এর নাম জমিদারী? এমন নির্ভুর লোককে বলে জমিদার? আর তিনিই হচ্ছেন আমার মনিব?

জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। চৌদ্দ বছর বয়সেই মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যেটুকু লাভ হয়েছে, তাতে মনটা তিক্ত হয়ে উঠেছে খুবই। এর আগে আমার মন বড়লোকদের বিরুদ্ধে কখনো এতটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। এখন এই সব পৈশাচিক আচরণ স্বচক্ষে দেখে আমার প্রাণের ভিতরে যেন একটা রাক্ষসের প্রতিহিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো।

মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলতে লাগলাম—“শক্তি দাও ভগবান! শক্তি দাও! সুখ চাই না, বিলাস চাই না,—মানসঙ্কম, ঐশ্বর্য কিছুতেই আমার দরকার নেই। শুধু আমাকে শক্তি দাও, যেন তারই সাহায্যে গরীবের মহাশত্রু এই রকম বড়লোকদের আমি ধ্বংস করতে পারি।”

যাক। এর পরই একটা সুযোগ এসে গেল। নদীর পরপারে বনকালীর মন্দির! সেখানে পূজো পাঠাতে হবে। চাকরদের মধ্যে আমি ছেলে মানুষ—তায় ব্রাহ্মণ। আমাকে নদী পার হয়ে সেখানে পূজো দিয়ে আসবার হুকুম হ’য়ে গেল।

একটা তামার থালায় কিছু ফল-মূল, ফুল-বিল্বপত্রাদি নিয়ে চললাম সেখানে পূজো দিতে।

পূজো ঠিক পৌঁছে দিলুম বটে, কিন্তু আমি আর ফিরলাম না। শুধু হাতে, নিঃসম্বল অবস্থায় মাঠের পথ ধরে আবার সেই ক্রোশের পর ক্রোশ ভেঙ্গে চললাম—কোথায় কোন্ অনির্দিষ্টের অভিমুখে।

ভেরো

চল্লাম বটে, কিন্তু সে চলার শেষ আর মেলে না। সেদিকে মাঠের পর মাঠ, তার পরে মাঠ। মাঝে মাঝে এক একটা বিল, জলা বা জঙ্গল। চাষের ক্ষেত বড় একটা চোখে পড়ে না। মাঠে কেবল খড় আর কাঁটা-গাছের রাজ্য। না জেনে শুনে এমন পথে পা দিয়েছি মনে করে বুকটা বড়ই দমে গেল। তবু যথাসম্ভব জোরে জোরে পা চালাতে লাগলাম—কেবল আশায় ভর করে।

ক্রমে দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। শেষে একটা জলায় নেমে আঁজলা করে জল খেয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে লাগলাম, কোন একটা লোকালয় পাবার আশায়।

শেষে একটা নানা রকম গাছঘেরা গ্রাম চোখে পড়লো। কিন্তু সেটা অনেক দূরে—বোধ হয় তখনও দু'কোশ। দ্বিগুণ উৎসাহে সেই দিকেই পা চালিয়ে দিলাম।

কিন্তু অল্পদূর যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, আমার শরীর যেন কেমন কেমন হ'য়ে আসছে! মাথা বেজায় ভার, সেই সঙ্গে বমির একটা তীব্র ভাব। এক মুহূর্তে মহা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বুঝলাম,—জলার পচা জল খেয়েই আমার এমন দশা উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু উপায় নেই—চলতেই হবে। নইলে সেই তেপান্তর-মাঠের মধ্যেই মরণ অনিবার্য। পারি না, পারি না, করেও তাই প্রাণপণে ছুটে চললাম সেই গ্রামটির দিকে।

যত্নপথের বাড়ী

গ্রামের সীমা পেলাম ঠিক সন্ধ্যায়। প্রথমেই একটা নদীর বাঁক। আমাব ডান দিক থেকে এসে ঠিক সেইখানটিতে নদীটা ঝুঁকে গিয়েছে। নদীর ধারে একসঙ্গে দুটো তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। তার বশি দুই তফাতেই দেখা যাচ্ছে লোকালয়। ভাবলাম প্রথমেই যে বাড়ী পাবো, সেখানেই আশ্রয় নিতে হবে।

কিন্তু তালগাছের কাছে আসতেই হঠাৎ শুরু হলো বমি। সঙ্গে সঙ্গে কি ভয়ানক কাঁপুনি। সাধ্য কি যে আব এক পাও এগোই! দাঁতের উপর দাঁত যেন চেপে বসতে লাগলো! দম আর ফেলতে পারি না। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে সেইখানেই মুখ থুড়ে পড়লাম। তাবপর কখন যে চৈতন্য লোপ পেয়ে গেল, তা বলতে পারি না।

সারা রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল, জানি না। সকালেও সেই অবস্থা। একবার শুধু স্নানকেন্দ্রের জল বোধ হলো কে যেন আমায় কি বলছে! কিন্তু পরক্ষণেই আমার বেহুঁস হয়ে পড়লাম।

এরপর যখন আবার জ্ঞান হ'লো, তখন বুঝলাম যে আমি একটা বিছানার উপরে শুয়ে আছি। আমার শরীরে আর কিছুই নেই। অতি কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার মাথার কাছে একজন দেবীরাপিণী বিধবা বসে আছেন। তাঁর চোখ দুটিতে কি অসীম করুণার ভাব মাথা! তাঁর মুখখানিতে কি অগাধ মমতা আর সান্ত্বনার অভিযুক্তি!

বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

ইনিই আমার মা—তোমার স্ত্রী অনিতার জননী। মানুষীর ছদ্মবেশে স্বর্গের দেবী যে পৃথিবীতে বাস করেন, জীবনে তা আমি

মৃত্যুপথের যাত্রী

সেইদিনই প্রথম জানলাম। তাবপর তাঁবই স্নেহে আব তাঁবই দয়ায় অনেকদিন পরে আ ম যেন নূতন ভাবে নূতন জীবনে জেগে উঠলাম।

নূতন জীবনই বাটে। এব সঙ্গে আমাব সেই চির ছুঃখ-কষ্টসঙ্কুল অতীত জীবনের কোথাও এতটুকু মিল নেই। সেই স্নেহ দয়া মায়া ইত্যাদি হতে চির বঞ্চিত, সেই আবিচার অত্যাচার আর অযথা উৎপীড়নের দ্বারা চিব-উৎপীড়িত, সেই অশেষ ছুঃখ-কষ্ট আমি যেন সেই নদীতীরের তালগাছের তলায় ম'রে একটা অভিনব মায়ার রাজ্যে এসে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানে মায়ের অফুরন্ত স্নেহের সঞ্জীবনী-শক্তিতে জড় পাষণেও জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন, অমাবস্থার জমাট অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলে ওঠে পৌর্ণমাসীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, নরকের তীব্র দহনজ্বালার উপরে নিজে নিজেই এসে পড়ে অমৃতের প্রলেপ। কি পুণ্যফলে আমি যে এমন মায়ের স্নেহাশ্রয়ে এসে পড়েছিলাম, তা আজও আমি ভেবে ঠিক করতে পারি ন।

রোগ থেকে মুক্ত পেলাম, পূর্বস্বাস্থ্যও ফিরে এল, কিন্তু আমি সেখানে মায়ের কাছে একেবারেই বাঁধা পড়ে গেলাম। মায়ের একটি মাত্র মেয়ে অনিতা তখন ছ'বছরের শিশু। আমিই ছলাম মায়ের বড় ছেলে, মায়ের অতি আদরের পালিত সন্তান।

আদর যে এত মিষ্টি, স্নেহ যে এত কোমল, মায়া যে এমন মনোহর, এর আগে কোনদিন তার একটুও জানতে পারিনি। জানলাম এই চৌদ্দ বছর বয়সে, এই সাক্ষাৎ ভগবতীর মত মা আর ননীর পুতুলের মত বোন পেয়ে। হায় রে! স্বর্গের এমন আশীর্বাদ,

—পৃথিবীতে থাকতেও যারা অপরকে তা থেকে বঞ্চিত করে রাখে, তাদের মত মহাপাপী কি আর ব্রহ্মাণ্ডে আছে ?

বড় সুখে, বড় আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম। মায়ের কাছে আমার আশ্রয়স্থান সবিস্তারে সবট বলেছিলাম। সেই সঙ্গে বলেছিলাম আমার জীবনের প্রধান সঙ্কল্পের কথা।

মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার, গরীবের প্রতি বড়লোকের প্রাণহীন নিষ্ঠুর ব্যবহার, বাংলার দিকে দিকে যে হাহাকারের সৃষ্টি করে তুলেছে, আমি যে তারই প্রতিহিংসা নিতে কৃতসঙ্কল্প, সে কথা মায়ের চরণে বেশ প্রাণ খুলেই নিবেদন করেছিলাম।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মা আমার মাথাটা তাঁর কোলের উপর সম্মুখে টেনে নিয়ে গদগদ স্বরে উত্তর করেছিলেন :

“বাছারে। এতটুকু বয়সে যে পাহাড়-প্রমাণ দুঃখ তুই পেয়েছিস, আমার সমস্ত বুকটা দিয়েও আমি তা মেপে উঠতে পারছি না। তোর যে এমন কঠোর সঙ্কল্প হবে, এ তো স্বাভাবিক। আমার বোধ হয়, এ বুঝি ভগবানেরই খেলা। তিনি যে তোকে তোর জন্ম হতেই এতটা নির্যাতন সহিতে দিয়েছেন, সে শুধু তাঁরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্তে। দরিদ্রনারায়ণের দুঃখে নারায়ণের আসন টলেছে নিশ্চয়। তাই হয় তো তোকে দিয়েই তিনি এর প্রতিকার করতে চান। নইলে এই কচি বয়সে, এই দারুণ প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তোর হবে কেন ? যাক্—তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হবে—কেই বা তা রোধ করবে বল ? তবে যাই করিস, দেখিস বাবা। যেন নিজের জন্তে পরের অনিষ্ট করতে যাস না। নিঃস্বার্থভাবে যা করা যায়, সেইটিই কাজ,—তাতে পাপ নেই। কিন্তু স্বার্থের গন্ধ থাকলেই

ধৃত্যপথের যাত্রী

সেটা পাপকাজ—ভগবানের দয়া তাতে পাবি না। এইটুকু সর্বদাই বুঝে চলিস্। এর বেশী তোকে আমার বলবার কিছু নেই।”

মায়ের সে উপদেশ আমার ভবিষ্যৎ দৃশ্য-জীবনে যে কি প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, তা আমি বলে শেষ করতে পারি না। প্রতি-হিংসার তাড়নায় আর সঙ্কল্পের খাতিরে অত্যাচারী ধনী মহাজনদের সর্বস্ব লুট করে তাদের মধ্যে অনেককেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কবে এসেছি ; কিন্তু একদিনের জ্ঞেও আমার মনে হয়নি যে, আমি কোন পাপ করেছি। যা কিছু আমি করেছি, তাতে প্রেরণা জুগিয়েছে শত-সহস্র নিগৃহীত দরিদ্রনারায়ণের কাতর আবেদন, আর তাতে উপকৃত হয়েছে তারা।

যাক্। সে সব পরের কথা। এমন অশেষ করুণাময়ী জনমীর কোলে আশ্রয় পাবার পরে, আবার কেমন করে আমি এমন হৃদ্যন্ত দৃশ্য হয়ে উঠলাম, সেই কথাই আগে তোমাকে সংক্ষেপে বলছি, শোনো :

মায়ের কাছে খুব যত্নের সঙ্গেই আমি প্রতিপালিত হতে লাগলাম। একদিকে যেমন প্রচুর ভোগ, অতীতিকে তেমনি নানা-রকম স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা! কুস্তি, ব্যায়াম, লাঠি, সড়কীখেলা, ঘোড়দৌড়, সাঁতার—সব তাতেই হয়ে উঠলাম অসাধারণ দক্ষ। দু'বৎসর পরে আমার ওস্তাদেরা আর আমার সুস্থখে দাঁড়াতে পারে না। পাণ্ডবগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা পেয়ে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন যেমন তাঁরই আশীর্ব্বাদে তাঁকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, আমিও তেমনি আমার ওস্তাদের ডিঙ্গিয়ে তাঁদের অনেক উপরে

উঠে গেলাম। গায়ের জোর আর অন্ত্রচালনায় আমার সমকক্ষ বলতে কেউ আর রইলো না।

আমার মায়ের অবস্থা পূর্বের খুবই ভাল ছিল। তাঁর স্বামী ছিলেন ওই অঞ্চলের পুরুবান্ধুক্রমে বিশিষ্ট একজন জমিদার। কিন্তু তাঁরই একজন দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি গোবিন্দলাল নানা কৌশল, ছলনা আর জাল জুয়াচুর করে জমিদারীর প্রায় চৌদ্দ আনা অংশ ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল। তিনি এ বাখা সহ্য করতে পারেননি। তাই অন্তরাত্মের জন্মে ঠিক পরেই অকস্মাৎ হার্টফেল হয়ে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

গোবিন্দলালের অত্যাচার কিন্তু চলছিল ঠিক সমান ভাবে। সে জন্মে আমার মাকে খুব সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে বাস করতে হতো। কিন্তু আমি সেই রকম বলবান আর খেলোয়াড় হয়ে ওঠার পর হতে সে ভয় তাঁর আর রইলো না।

মায়ের উপর কোন অত্যাচার করতে সে সাহসী হল না বটে, কিন্তু গরাব প্রজাদের উপর হতে লাগলো অকথ্য অত্যাচার। ইতিপূর্বে চিরদিন তারা মায়েরই প্রজা ছিল। ইদানীং গোবিন্দলালই হয়ে উঠেছে প্রায় সবটুকু জমিদারীর মালিক। মায়ের যেটুকু সামান্য অংশ অবশেষ আছে, তাও সে গায়ের জোরে দখল করতে চায়। প্রজারা কিন্তু বেইমানী করতে চায় না। এই ক্ষেত্রেই তাদের উপর নানারকম জুলুম চলতে লাগলো।

রাধানগরে যে পশুত্বের অভিনয় দেখে এসেছি, এখানেও প্রায় তাই। প্রজারা দলে দলে মায়ের কাছে এসে কাঁদতে থাকে। কিন্তু মা আমার নিরুপায়। কি প্রতিকার তিনি

যত্নপথের বাড়ী

করবেন ? তিনিও তাই তাদের ছুঁখে তাদের সঙ্গেই কাঁদতে বসে যান ।

আমার দেহে আগুন জ্বলতে থাকে । মায়ের চোখে জল দেখে আমার আর কোন নীতি, কোন আইন মানবার প্রবৃত্তি থাকে না ! মনে হয় তখনই বাবের মত লাফিয়ে গিয়ে পড়ি, গোবিন্দলাল আর তার সাহায্যকারীদের সবংশে ধ্বংস করে আমার মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিই ; মায়ের প্রজারাও সেই সঙ্গেই পেয়ে ঢাক্‌ নিষ্কৃতি ।

কিন্তু সে কাজে বাধা পাই মায়ের মৃত্ত্ব ভৎসনায় আর অনিত্যতার কান্নাতে । আমাকে রাগতে দেখলেই সে কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়, আর প্রাণপণে আমার গলা আকড়ে ধরে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে । বাধ্য হয়ে মনের আগুন মনে চেপে, নানা উপায়ে তাকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠি ।

কিন্তু মন আব কিছুতেই মানতে চায় না ! শৈশব থেকে যে, তুষের আগুন চিরদিন বুকের মধ্যে ধিকি-ধিকি জ্বলছে, সে আর কিছুতেই চাপা থাকতে রাজী নয় । সে চায় এইবার দাবানলের মত জ্বলে উঠে এক নিমেষে সারা দেশটা ছারখার করে দিতে । মনে হ'ল—মানুষ হয়ে জন্মে, মানুষের প্রতি পশুর অত্যাচার যদি দমন করতে না পারি, তবে কিসের জীবন ? কেন তবে এত উৎপীড়ন স'য়ে বেঁচে থাকা ? মায়ের চোখের জল, আর ভায়েদের করুণ আর্ন্তনাদই যদি দেখতে বা শুনেতে হয়, তবে নিজের ভোগবিলাস, সুখ-স্বচ্ছন্দ্য নিয়ে মত্ত থাকার চেয়ে পশুদের নিদর্শন আর কি থাকতে পারে ?

যত্নপথের যাত্রী

ভিত্তিকারী কি বেদমন্ত্রই আমার কানে ঢেলে দিয়েছিল। তার প্রতিটি শব্দ তখনো আমার বুকের মধ্যে গাঁথা ছিল। সে বলেছিল—“আমি মানি আর আমি বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবীতে যারা হতভাগ্য, যারা দীনহীন, তারা সকলেই আমার ভাই—আমার আপনার লোক। কিন্তু ভদ্রলোক বা বড়লোকেরা আমাদের শত্রু।”

সেই গরাব ভাইদের প্রতি নৃশংস জমিদার ও বড়লোকদের এত অত্যাচার। এর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আর মনকে শান্ত রাখতে পারি না।

কিন্তু কি উপায়? কোথায় সেই প্রতিশোধের পথ? ভেবে আর কিছু ঠিক করতে পারি না। যত দিন যায়, মন ততই অধীর হ’য়ে ওঠে। নিত্য-নতুন অত্যাচারের সংবাদ আমার জ্বলন্ত হিংসার আগুনে আরও যেন ইন্ধন যোগাতে থাকে।

মায়ের কাছে আদরে, যত্নে, ভোগে, বিলাসে দিন কাটে, কিন্তু তবু মনের অধীরতা ক্রমেই যেন বেড়ে ওঠে। আমি যথাসাধ্য গোপন করে চলি, কিন্তু মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে যায়। মা আমাকে কত উপদেশ দেন, কত বোঝান; কিন্তু সে সব কথায় নূতন কিছুই খুঁজে পাই না। আমারও প্রাণ তাই তাতে সাস্থ্য নাহি মানি না।

তখন কুড়ি বৎসরে পা দিয়েছি। এই বয়সেই আমি একজন মস্ত পালোয়ান। বাল্যের সেই ভীক, গুজ্জুগুজে দুর্বল ছেলের পরিবর্তে এখন আমি যেমন বলবান, তেয়ি দুঃসাহসী। মায়ের আশীর্ব্বাদে আমার সেই গোজন্ম ঘুচে গিয়ে, আমি যেন এখন একটা দস্তুরমত মানুষ হ’য়ে উঠেছি।

মৃত্যুপথের রাজা

এমনি সময়ে আমাদের গ্রামের পাশে নদীর তীরে সেই জোড়া তালগাছের তলায় একজন সাধু এসে আড্ডা গাড়লেন। সাধুর বেশ-ভূষায় ভগুমীর বাহুল্য নেই। তাঁর না আছে দীর্ঘ জটা, না আছে কোঁটা-তিলক-চন্দনের ঘটা, না আছে গাঁজা টানার ধুম। গৈরিক বসন আব গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা—এই ছিল তাঁর সাধুত্বের একমাত্র নিদর্শন। হাতদেখা, ভাগ্যগণনা, বা কবচ-মাছুলী দান একেবারেই ছিল না। কাজে কাজেই প্রথম হ’তে তাঁর প্রতি অনেকেরই কেমন একটা শ্রদ্ধা এসে গেল।

সাধুর কোন অহঙ্কার নেই। যে যায়, তার সঙ্গেই তিনি হেসে কথা বলেন। কোতূহলী হ’য়ে আমিও একদিন গেলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সেই দিনই বুঝলাম, সাধু এক অপূর্ব ধরনের লোক। সাধু হলেও ধর্মের কোন গোঁড়ামী তাঁর ভিতরে নেই। দেব-দেবী পূজা বা লৌকিক ধর্মাচারকে তিনি প্রকৃত ধর্ম বলে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, “ওগুলি সব ভগুমী।” তাঁর মতে ভগবান বা ঈশ্বর একটা স্বতন্ত্র সত্তা নয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভগবান্। পৃথিবীর জীব জন্তু মানুষ প্রভৃতিকে অবহেলা বা ঘৃণা করে, মাটি বা পাথর দিয়ে ভগবানের মূর্তি গড়ে পূজা করলেই ভগবানের পূজা করা হয় না। সর্ব জীবের সেবা আর বিশেষ করে মানুষের উপকার করলেই প্রকৃত ধর্মাচরণ করা হয়—কারণ, মানুষই ভগবানের স্বরূপ।

অবাক হয়ে গেলাম। সাধুর উপর প্রগাঢ় ভক্তি এসে গেল। সেই থেকে প্রতিদিনই তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম।

স্বপ্নাশ্রমের রাজী

আমার নিজের জীবনের আত্মজ ইতিহাস ও আমার সঙ্কল্পের কথা সবই তাঁর কাছে প্রকাশ করলুম। তিনি কেবল একটু হাসলেন।

খানিক চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন—“বেটা! আজও তুই বুঝতে পারবি না যে, ভগবান তোরই বুকের মধ্যে রয়েছেন? তিনিই তোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌গুলো পাপ আর কোন্‌গুলো ধর্ম। আর যে সঙ্কল্পের কথা তুই বলছি, ওটা তোর বাহ্যিক নয়—এটা হচ্ছে তাঁরই নির্দেশ। তিনি চান একের ভিতরে তাঁর দশশক্তি জাগিয়ে তুলে অপর দশজনের মহাপাপের দণ্ড দিতে। তাঁর তো আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাই মানুষকে দিয়েই তিনি তাঁর কাজ করিয়ে নেন।

মহাভারতের কথা ভেবে স্বাখ্। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান্। তিনি কি হচ্ছে করলে একদিনেই পৃথিবীর ভার হরণ করতে পারতেন না? তবে কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তিনি পাপী আর পুণ্যাত্মা দুই দলেরই মৃত্যু ঘটালেন কেন? কাজ ভগবানের, কিন্তু করে মানুষে—কারণ মানুষই তাঁর পূর্ণ স্বরূপ।”

সাধুর কথায় কি উৎসাহ যে প্রাণে এসে গেল, তা আর বলতে পারি না। আমি তখন তাঁর পা জড়িয়ে বললাম :

“আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি একজন মহাপুরুষ। দয়া করে আপনি আমায় শিখা করে নিন, আর আমায় বলে দিন যে,— এখন আমি কি করবো? মানুষের ওপর মানুষের অন্যায় অত্যাচার দেখে দেখে আমার মনের ভিতরটা পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। আমি অতি সামান্ত লোক—তবু আমার মনে এর প্রতিহিংসার বাসনা জেগে উঠলো কেন, তা আমি বুঝতে পারতাম না। এখন জানলাম সেটা

মহাপুত্রের বাজী

ভগবানের নির্দেশ। তবে বলুন, কি করলে আমি তাঁর আদেশ পালন করতে পারবো ?”

সাধু আমার মাথার হাত বুলাতে লাগলেন। বল্লেন—“বেটা ! তোকে উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তোর ভিতরে যে অগ্নি-মন্ত্রের বীজ রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলা আমার কাজ নয়। আমার গুরুদেব অগ্নিমন্ত্রের সিদ্ধ-সাধক। তিনিই কেবল তোকে পথ দেখাতে সমর্থ। যাবি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ? বিজ্ঞ যেতে হবে গোপনে। আর, হয়তো একবার গেলে আর সহজে ফিরতেও পারবি না।— পারবি যেতে ?”

দৃঢ়স্বরে বললাম—“হ্যাঁ, পারবো। যদি মনের মত পথ খুঁজে পাই তো ফিরে আসবার চেষ্টা করবো না—আসতে চাই না। এখন বলুন, দয়া করে আমায় সেই মহাপুত্রের কাছে নিয়ে যাবেন ত ?”

সাধু সন্মত হলেন। যাত্রা সম্বন্ধে পরামর্শ শেষ করে আমি মায়ের কাছে ফিরে এলাম। দুদিন আর কোথাও গেলাম না। অনিতাকে কত রকম আদর-যত্ন করতে লাগলাম। মায়ের জুগে ভারী কষ্ট হতে লাগল, তবু মনের অসাধারণ শক্তিতে তা দমন করে রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাসও মাকে জানতে দিলাম না।

তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রে সাধুর সঙ্গে সেই মহাপুত্রের দর্শন আশায় আবার সেই অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা করলাম।

ভোপ

তেজস্কর আবার একটু বিশ্রাম ক'রে নিলে। তারপর আবার শুরু করলে :

“এইবার খুব সংক্ষেপেই আমার জীবনী শেষ ক'রবো—কারণ সত্য গোপন না ক'রলেও এমন কথা আমি তোমাকে জানাতে পারি না, যাতে পরের অনিষ্ট হওয়া সূনিশ্চিত। আমি শুধু আমার পরবর্তী জীবনের মোটামুটি আভাস তোমাকে দিয়ে যাবো।

সাধুর সঙ্গে হাজির হলাম বড় দূরবর্তী একটা পাহাড়ে।

সেখানে একটা দেবালয়কে কেন্দ্র ক'রে কয়েক জন সাধু-সন্ন্যাসীর একটা আশ্রম আছে। সাধুদের সঙ্গে কয়েকদিন আমাকে সেই আশ্রমেই কাটাতে হ'লো।

আশ্রমের যিনি প্রধান সাধু, তিনি একে একে আমার সব কথাই জেনে নিলেন। তারপর আরম্ভ হ'লো পরীক্ষা। সে যে কি ব্যাপার, তা আর তোমাকে কি বলবো? মোটের উপর কিছুদিন পরে জানতে পারলাম যে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। তখন সেই মহাপুরুষের কাছে অগ্নিমন্ত্রে আমার হ'লো দীক্ষা।

দীক্ষার কথা তোমাকে বলেই বা কল কি? তবে জেনে রাখো যে, সেটিদিন থেকে আমার জীবনের প্রধান কর্তব্যই হ'লো দেশের দরিদ্রনারায়ণের হৃদয় দূরীকরণ। নিজের ভোগ-বিলাস, ঐশ্বর্য্য, সুখ-শান্তি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে কেবল দরিদ্র ও দুর্বলদের সকল দায় থেকে বখাসাধ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই আশ্রমের নির্দেশ ও আদেশ

যত আমাকে যে কোন কাজ অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। তাতে জায়-অজায়, ধর্ম-অধর্ম, উচিত-অনুচিত—কোন বিচারই আমি করতে পারবো না।

আমার চিরদিনের সঙ্কল্পও ছিল তাই। সুতরাং এই অগ্নিমন্ত্রকেই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা বলে আমি সগর্ব্ব আঁকড়ে ধরলাম।

মন্ত্রের সাধনায় তার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম কর্মক্ষেত্রে। বাংলা ও বিহারের যে যে স্থানে এই আশ্রমের গুপ্ত শাখা-প্রশাখা ছিল, আর যে যে দেশে বা সহরে অগ্নিমন্ত্রের গুপ্ত সাধক বাস করতো, তারা অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাকেই তাদের নেতা বলে স্বীকার করে নিলে। ফলে সেই মহাপুরুষের রূপায় আমিই হলাম তাঁর অগ্নিমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক—আমিই হলাম তাঁর প্রধান কর্মী।

আশ্রমের নিয়ম অনুসারে আমার প্রকৃত নাম গোপন রেখে মহাপুরুষ প্রদত্ত তেজশঙ্কর নামেই আমি অল্পদিনের মধ্যেই দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হয়ে পড়লাম।

ইতিপূর্বে অগ্নিমন্ত্রীদের সংখ্যা হয়েছিল বিস্তর। নানা দেশে, নানা কাজে তারা আত্মগোপন করে ফিরতো, কিন্তু উপযুক্ত নেতার অভাবে তাদের কাজ তেমন সুশৃঙ্খলভাবে চলতো না। আমাকে নেতারূপে পেতেই তাদের উৎসাহ দশ গুণ বেড়ে গেল। তারপর হঠাৎই তেজশঙ্করের নামে দেশ-বিদেশের টনক নড়ে উঠতে শুরু করলে।

অগ্নিমন্ত্রের কর্মীর বেশে সব প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করলাম রাধানগরে। তখন লাটের কিস্তির মুখ। গরীব প্রজাদের রক্ত শোষণ

যুগ্মপথের বাজী

ক'রে জমিদারের খাজাঞ্চিখানা তখন ভরপুর' গভীর রাতে 'মার মার' রব ক'রে জমিদারের বাড়ীতে গিয়ে পড়লাম।

আমি জানতাম যে তাদের বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল, সবই আছে—কিন্তু চালায় কে? গরীবদের ওপর যারা জুলুম করে, তারা কখনো বীর হ'তে পারে না।

পরিচয়ও পেলাম তারই। ঘা দিলে পাছে দস্যুরা আরও ক্ষেপে যায়, সেই ভয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়ে কেউ খাটের তলায়, কেউ পায়খানায়, কেউ বা খড়গাদার নীচে ঢুকে পড়লো। আমরা নগদ দশহাজার টাকা, আর বাড়ীর মেয়েদের সোনা, কপো আর জহরতের গহনাতে আরও প্রায় দশহাজার নিয়ে বুক ফুলিয়ে চ'লে এলাম। বাধা কেউ দেয়নি বলে প্রথম যাত্রায় মানুষের রক্তপাত করতে হ'লো না।

তখন দারুণ দুর্ভিক্ষের রাজ্য। বন্যায় শত শত গ্রাম ডুবে যাওয়ার কলে উত্তর আর পূর্ববঙ্গে গরীব চাষীদেব ঘরে ঘরে হাহাকার। দয়াল দাদার নাম ক'রে আশ্রম থেকে সাহায্য বিতরণ শুরু হ'য়ে গেল। নরখাদক রাফসের বুকের রক্তে হ'লো কত মানব-শিশুর ক্ষুধা দূর।

তারপর একের পর একটা ক'রে বাংলার বহুস্থানে হানা দিতে শুরু করলাম। মায়ের আশ্রয়ে থাকবার কালে মায়েরই দয়ায় যে অটুট শক্তি আর তীর চালনা শিক্ষা করেছিলাম, তার বলে আমি হয়ে উঠেছিলাম এক দুর্দ্বন্দ্ব দস্যু। আমার গতি রোধ করে, কিংবা অস্ত্র-চালনায় আমাকে পরাস্ত করে, এমন লোক বাংলাদেশে আমার নজরে পড়লো না। কাজেই সর্বত্রই আমাদের জয় জয়কার। ধনীর ভাণ্ডার

মৃত্যুপঙ্খের স্বাক্ষর

শুণ্য ক'রে এনে দীন-দুঃখীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে লাগলাম। বিলানোর কাজটা অবশ্য আশ্রমের সাধুদেব দ্বারাই হ'তে লাগলো। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শাখার মারফৎ দরিদ্রেরা তাদের একান্ত অসময়ে সাহায্য পেতে লাগলো।

ধনীদের উপর বাল্য হ'তেই আমি বাতশ্রদ্ধ। ধনবান্দের সর্বনাশ-সাধন আমার জীবনের সঙ্কল্প বলেই গ্রহণ করেছিলাম। তাই এই দস্যুতার কাজে একটি দিনেব জন্তোও আমার প্রাণে বিন্দু গাত্র অনুতাপ আসেনি। আমি বরং উত্তবোহব অধিকতর উৎসাহের সঙ্গেই অগ্নিমন্ত্ৰেব সাধনা ক'বে চলেছিলাম। কারণ, আমাদের লক্ষ্য ছিল কেবল সেই সব ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি, যারা তাদের ধনভাগ্যের পূর্ণ করে থাকে শত শত দীন-দরিদ্র লোককে অতায় ভাবে বঞ্চিত ক'রে; কিংবা যারা তাদের ভাগ্যলব্ধ বিপুল সম্পদ কেবল নিজেদেরই ভোগ-বিলাসে ব্যয় ক'রে যায়; কিন্তু দেশের শত শত নিরন্ন, বুভুক্ষিত হতভাগ্যের দিকে একটি দিনের জন্তোও মানুষের প্রাণ ঝিনিয়ে ফিরে থাকায় না।

এরকম জুলুমের কাজে মাঝে মাঝে নরহত্যা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু আমি যথাসাধ্য তা' এড়িয়ে চলতাম। আত্মবক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে আমি কখনো কারও প্রাণ নষ্ট করিনি। সঙ্গীদের উপরেও আমার সেই রকম কঠিন আদেশ দেওয়া ছিল। নারী-জাতির প্রতি অত্যাচার কিংবা বিনা প্রয়োজনে নরহত্যা—অগ্নিমন্ত্ৰের নীতি-বিরুদ্ধ।

কিন্তু তবুও ছ'চার ক্ষেত্রে ইচ্ছা ক'রেই আমি নিজের হাতে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেছি। মহাভূতবৃন্দের বিরুদ্ধে যে দারুণ

প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি পূর্ব হ'তেই আমার মনে পুঞ্জীভূত হ'য়ে ছিল, তার কঠিন প্রেরণা থেকে কিছুতেই আমি আনাকে মুক্ত করতে পারিনি। সেই সব হতভাগ্যদের জন্য দুঃখ হয়,—দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তারা মানুষ হ'য়েও মানুষের মত হয়নি; নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলে তারা ভাবতে শেখেনি।

আমি প্রথম নরহত্যা করি খঞ্জনপুরে। দুর্বৃত্ত গোবিন্দলাল বহুদিনের চেষ্টায় একদল গুপ্তা সংগ্রহ ক'রে আমার মায়ের ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল আমার মা আর অনিতাকে খুন করিয়ে তার জমিদারী নিষ্কটক করতে। কিন্তু আমি পূর্ব হ'তেই তার বিরুদ্ধে চর নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলাম—সে-সন্ধান সে রাখতো না। ফলে ডাকাতদের উপরেই হ'লো ডাকাতি।

দারুণ আক্রোশে পড়ে তার দলের ৫১৬ জনকে হত্যা ভেদ করলামই, উপরন্তু গোবিন্দলালের মাথাটাও আনলাম নিজের হাতে কেটে। একদিন মায়ের চোখের জলে যে আগুনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই আগুনেই পাবণ গোবিন্দলাল সদলবলে দগ্ধ হ'য়ে গেল।

ইতিমধ্যে তেজশঙ্করের নামে দেশ-বিদেশে আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়ে পড়েছিল। সরকার বাহাদুর যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করেছিলেন আমাকে দমন করতে। কিন্তু কোথায় পাবেন আমার সন্ধান? গভীর অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে যে বাস করে, লাঠির উপর ভর দিয়ে যে রাতের অন্ধকারে দশ বিশ ক্রোশ পথ ঘুরে আসে—তাকে ধরা সহজ নয়।

রংপুরের জমিদার দুর্গাশঙ্কর ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে ধরাকে সন্ধান

যুদ্ধাপথের যাত্রী

জ্ঞান করতো। যাদের রক্ত শোষণ ক'রে তার অত ঐশ্বর্য, সেই প্রজাদের উপর সে ভয়ানক অত্যাচার সূচু করলে।

লোকটা নিজে -প্রচণ্ড মাতাল, তার উপবে আবার চরিত্রহীন। তার অত্যাচারে গবীব প্রজাদের জাত-মান বজায় রাখা ছুঃসাধ্য হ'য়ে উঠলো। অনেক স'য়ে, শেষে তাবা করলে ধর্শ্বঘট।—আর যাফ কোথায়? অহঙ্কারে অন্ধ জমিদার প্রজাদের উপরে হিংস্র পশুর মত আচরণ করতে লাগলো। প্রজারা একেবারে পবিত্রাহি চীৎকার শুরু ক'রে দিলে।

দলে দলে প্রজাদেব উপর জমিদারের লাঠিয়ালরা লাঠি চালিয়ে দিলে। কত প্রজা মবলো, কত হ'লো সাংঘাতিকরূপে আহত। কিন্তু তাতেও নিষ্ফলি নেই। বিস্তার প্রজার ঘর আগুনে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। অনেকের ক্ষেতের শস্য, গোলার ধান জমিদারের পাইকরা লুট ক'রে নিয়ে গেল। নিরীহ দরিদ্র প্রজাদের হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভ'রে যেতে লাগলো।

বাংলার প্রায় সর্বত্রই আমার দলবল আছে; অথচ আজ পর্যন্ত কেউ জানে না যে তারা কে? দুর্গাশঙ্করের কীর্তির কথা আমার ঐ দলবলের মারফৎ আমার কানে এসে বাজলো। দাক্ষিণ নিয়ে চল্লাম তার উপরে প্রতিহিংসা নিতে।

তোমরা সে কথা শুনেছ নিশ্চয়। জহুরীর ছদ্মবেশে তার বাড়ীতে উঠে দিন ছপু'রেই তার বৃকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছি। তারপর তার অনুচরদের মধ্যে কয়েকজনকে জন্মেব মত অঙ্গহীন ক'রে দিয়ে এমন ভাবে চলে এসেছি যে, কারও সাধ্য হয়নি আমার গতিরোধ করতে। আসবার সময় তাদের জ'নিয়ে দিয়ে

মৃত্যুপথের বাড়ী

এসেছি—দুর্গাশঙ্করকে যে দণ্ড দিয়ে গেল—সে আর কেউ নয়, স্বয়ং দম্ভা-সম্রাট তেজস্কর !

এই ভাবে রাজত্ব করে এসেছি এক-আধ দিন নয়, এক যুগ—বারো বছর। বাংলা আর বিহারের বুকের উপরে এম্মিভাবে আমি ঝড় সৃষ্টি করে বেড়িয়েছি।

আমি স্পষ্ট বুঝলুম যে, ভগবান আমার অস্তরের মধ্যেই আছেন। তিনি আমার শৈশব হ'তে আমার মনে-প্রাণে যে প্রবৃত্তির উৎস ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটা তাঁরই ইঙ্গিত ছাড়া কিছুই নয়। দরিদ্র-নারায়ণের সাহায্যে—কল্পে তাই আমি কঠোর পথ অবলম্বন করেছি। ভগবানেরই একান্ত আজ তিনি তা' করিয়ে নিচ্ছেন আমাকে দিয়ে—কারণ দরিদ্রনারায়ণের সেবকরূপে আমি তাঁর একজন প্রধান ভক্ত।

আমি অনুভব করলাম, আমার কর্তব্যই হচ্ছে দুষ্টির দমন আর শিষ্টের পালন। গত বারো বছর পরে আমি তা একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবেই পালন করে এসেছি। মায়ের সে উপদেশ আমি একটি দিনের জন্তও বিস্মৃত হইনি। মা বলেছিলেন—“দেখিস্ বাবা! নিজের জন্তে যেন কিছু করতে যাস্নি। নিঃস্বার্থ ভাবে যা করা যায় সেইটিই কাজ, তাতে পাপ নেই।” আমিও তাই কেবল দরিদ্রনারায়ণদের জন্তেই করে এসেছি অত্যাচারী ধনিকদের ধনের উপর দম্ভাতা—ক'রে এসেছি শয়তানের উপাসকস্বরূপ নির্মম নরপণ্ডদের হত্যা। তাতে আমার নিজের স্বার্থের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই।

বুড়াপথের বাড়ী

আমি থাকি বনে জঙ্গলে, গাছতলায় আর পাহাড়ের গুহায়।
খাই নিরামিষ অন্ন, আর ফলমূল। সন্ন্যাসীর বেশে গৈরিক বস্ত্র আর
কুড্রাক্ষ পরে যখন দেশে দেশে দরিদ্রনারায়ণদের কুটীরে কুটীরে ঘুরে
বেড়াই, তখন আমি তাদের সকলেরই দয়াল দাদা। আমারই নাম
ক'রে আমারই দস্যুতার অর্থ আশ্রমেব সন্ন্যাসীরা সময়ে অসময়ে
তাদের দান ক'বে থাকেন, তাই তারা সবাই আমাকে দয়ার অবতার
বলেই মনে করে। কিন্তু তারা জানে না যে, আমিই সেই তেজশঙ্কর,
সেই বিখ্যাত দস্যু-সম্রাট, যায় নামে দারা বাংলা আর বিহারে পড়ে
গিয়েছে থরহরি কম্প।

আজ আমি নিজেই এসে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।
নিজেই সেধে নিজের গলায় তুলে নিছি ফাঁসির দড়ি, তা নষ্টলে
কারও সাধ্য হ'তো না যে তেজশঙ্করকে এই পাখীর খাচার মধ্যে
এনে পূরবে। আমি মরছি, আমার দরিদ্রনারায়ণের উপকার আরও
পরিপূর্ণরূপে সার্থক ক'রে তুলতে—আত্মবলি দিয়ে!

দরিদ্রদের সেবক আমি। আমি তাদের রক্ষক, তাদের পৃষ্ঠ-
পোষক। কিন্তু, আমারই জন্তে আজ তাদের শুরু হয়েছে নির্যাতন।
তাদের যে কি দুর্গতি ভোগ করতে হ'চ্ছে, তা ভূমিও নিশ্চয় দেখতে
পাচ্ছে—কারণ, ভূমি 'জেলার'।

আমার কোন সন্ধান না করতে পেরে তোমার অযোগ্য সহ-
যোগীরা এই নিরীহ গরীবদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি শুরু ক'রে
দিয়েছে। এই তাদের বিচার। এই তাদের ধর্মজ্ঞান।

আমি তা কিছুতেই হ'তে দেব না। আমার জন্তে শত শত
নিরীহ লোকের দণ্ড হয়, প্রাণ থাকতে আমি তা সহ করবো না ;

মুতুপথের যাত্রী

তাদের নিকৃতি যেমন ক'রেই হোক, আমাকে দিতে হবে। কিন্তু আর কোন উপায় নাই। আমি ধরা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাদের উপরে অগ্নায় জ্বলুম চলতেই থাকবে। তাই নিরুপায় হ'য়ে আমি নিজেকে এসে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, কিন্তু তাদের তো নিকৃতি মিলবে।

ফাঁসি হবে, আগেই তা জানতাম। তা জেনেই ধরা দিতে এসেছি। তবে আর তাতে ভয়টা কিসের? এই ত' ভোর হ'য়ে গেছে। তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছি। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। তারপরেই সব চুকে যাবে। একটা উৎপীড়িত প্রতিহিংসাপরায়ণ জীবনের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে তেজস্কর চল যাবে, যেখানে তার ভগবান তাকে নিয়ে যান। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। দুঃখ যা-কিছু সে কেবল আমার গরীব ভাইদের জন্য। আর ত' আমি তাদের সেবা করতে পারব না! তা যাক। তুমি এখন যাও নিজের কাজে যোগ দাও গে। অনিতাকে আমার আশীর্বাদ আর সেই সঙ্গে আমার স্নেহ জানিয়ে ব'লো, তার দাদা মরবার কালেও তাকে ভোলেনি; তাকে আশীর্বাদ ক'ত করতেই মরেছে।

মাকে আর কি বলবে? তাঁকে আমার কোটা কোটা প্রণাম জানিও, আর ব'লো যে, তাঁর ছেলে তাঁর উপদেশ পূর্ণমাত্রাতেই পালন করেছে। ফাঁসিকাঠে ঝোলবার পূর্বমুহূর্ত পর্য্যন্ত সে তার নিজের জন্তে কিছুই করেনি। এতেও কি সে ভগবানের দয়াকে পাবে না।

তেজশঙ্করের বিচিত্র জীবন-কাহিনী সব শুনে উঠে আগবার পূর্বের জিজ্ঞাসা করলুম—“কিন্তু একটি কথার জবাব দিন—এই যে আপনার আপ্রাণ চেষ্টা, কঠোর সাধনা,—এতে ক’বে দরিদ্র জন সাধারণের স্থায়ী উন্নতি আপনি কি ক’রে গেলেন? আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে সঙ্গে, সামান্য যে স্বাচ্ছন্দ্যটুকু তারা পেত তাও ত’ চিরদিনের মত ঘুচে যাবে!”

একটু চুপ ক’রে থেকে তেজশঙ্কর বললে—“তা হয়ত যাবে—হিংসার পথে স্থায়ী কল্যাণ গ’ড়ে ওঠে না, শুধু প্রতিশোধ নেওয়া যায় মাত্র। সমাজের উন্নতি না হ’লে এর মীমাংসা হবে না ভাই! সব জানি—আমি শুধু প্রচণ্ড হিংসা বৃত্তিই চরিতার্থ ক’রে গেলাম, আর সেই জন্য তার মূল্যস্বরূপ এই প্রাণটাও দিতে হ’ল—হয়ত একদিক দিয়ে খুব ভুল করেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমার ভরসা এই, ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর নূতন মানুষ হ’য়ে যখন জন্ম নেবে—তারা আমার গল্প শুনে নিজেদের শুধুরে নিয়ে এমন কোন একটা উন্নত নিয়ম প্রবর্তন করবে, তার ফলে ভবিষ্যতে আর কো’তেজশঙ্করকে অনর্থক প্রাণ দিতে হবে না!”

‘জেলখানার ঘড়িতে ছ’টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই তেজশঙ্করের কঁাসি হ’য়ে গেল।

যে দুর্দান্ত দস্যুর দাপটে পুলিশের লোকদের আহা-নিজা চুকে গিয়েছিল, তার চরম দণ্ড হওয়ায় সকলে নিশ্চিন্ত হ’ল। কঁাসির খবরটা শুনে হাসতে হাসতে যে যার বাসায় ফিরে গেল। আমিও ফিরলুম। কিন্তু প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ

বজ্রপথের যাত্রী

করতে লাগলাম। ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে হ'তে লাগলো যে,—আজ যে মহা অপরাধীর মত ফাঁসির মধ্যে তার প্রাণ বিসর্জন দিলে, সে একজন মহা পরোপকারী আত্মত্যাগী মহাবীর।

তেজশঙ্করের সেই কথাটাই আজ বার বার মনে পড়ছে—এই পৃথিবীতে নূতন মানুষ হ'য়ে যারা জন্ম নেবে—তারা করবে এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা—যার ফলে ভবিষ্যতে আর কোন তেজশঙ্কর অনর্থক প্রাণ বলি দেবে না,—তারা গ'ড়ে তুলবে স্বর্গরাজ্য, যেখানে হিংসা নেই, রাগ নেই, অভাব নেই, বৈষম্য নেই—আছে শুধু অফুরন্ত স্নেহ-প্রীতি আর ভালবাসা!

সে দিন কি সত্যই আসবে? মানুষ কি সত্যই মানুষ হ'য়ে উঠবে?

সমাপ্ত